ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ।। ১২ বৈশাখ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৬ এপ্রিল, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

বিমানের হিসেবে 'রক্তাক্ত ভোট'

অশালীন তরজায় কং-তৃণমূল

গূঢ়পুরুষ।। কলকাতাসহ রাজ্যের ৮১টি পুরসভার আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সি পি এম এবং তৃণমূল দলের নেতা নেত্রীরা যে ভাষায় পরস্পরকে বিঁধছেন তা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। সাধারণভাবে এমন অশালীন ভাষার ব্যবহার এলাকা দখল নিয়ে অপরাধ জগতের মস্তানরাই করে। কোনও স্বীকৃত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা নয়। কলকাতা পুরসভার জন্য বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, আসন্ন পুরভোট রক্তাক্ত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমানবাবুর হুঁশিয়ারিকে 'হুমকি' বলে ধরে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে যান। স্পষ্ট বলে দেন, তাঁরা সিপিএমের বুলেটের জবাব দিতে প্রস্তুত। সিপিএম ভোটের আগে এ'ভাবেই মানুষকে ভয় দেখায়। রাজ্যের প্রধান দুই দলের দুই প্রধানের তরজায় উৎসাহিত হয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির হাবা গবা নেতারা হৈ হৈ করে আসরে নেমে কুৎসা ও খিস্তি দিয়ে বাজি মাত্ করতে চাইছে। কয়েকটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে বাক্য ব্যবহারে শালীনতা কোন তলানিতে ঠেকেছে। কলকাতার মৌলালিতে বামফ্রন্টের ছাত্র-যুব সংগঠনের জমায়েতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহম্মদ সেলিম তৃণমূল নেত্রীকে মা ছাগল এবং অন্যান্যদের স্রেফ ছাগলছানা বলেন। সেলিম বলেন, 'মা ছাগল যেখানে যায়, ছাগলছানারা তার পিছনে লাফাতে লাফাতে সেখানে যায়।'

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে ভাষার ব্যবহারে তৃণমূল নেত্রী তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সংযত। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা মোটেই নয়। হুগলি জেলা থেকে নির্বাচিত এক তৃণমূল সাংসদ অন্য এক মহিলা কংগ্রেস সাংসদ সম্পর্কে যে কুৎসিৎ ভাষায় মন্তব্য করেছেন তা' ছাপার অযোগ্য। ফলে হুগলি জেলায় কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের ঘোঁট এখন তুঙ্গে। একই অবস্থা নদীয়া জেলায়। সেখানে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শঙ্কর সিংহকে তৃণমূলের দুই সাংসদ মুকুল রায় এবং সুচারু হালদার 'মীরজাফর' 'গদ্দার' বলতে গিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সাধারণভাবে অন্ধকার জগতের সমাজবিরোধীরা করে থাকে। শঙ্কর সিংহও কম যান না। পেশায় চিকিৎসক সুচারুবাবুকে জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'যিনি তৃণমূলের কোনও নেতার গায়ে দাদ-হাজার মতো চুলকানির চিকিৎসা করতে করতে রাজনীতিতে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকে সুরুচিপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ প্রত্যাশা করা যায় না।'

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে নোংরা ভাষার ব্যবহার বামপন্থীরাই প্রথম আমদানি করেছিল। তারা প্রফুল্ল সেন, মায়া রায়, আভা মাইতিদের নিয়ে অশালীন দেওয়াল লিখনে ভরিয়ে দিয়েছিল। বাংলার সুশীল সমাজ সেদিন সব দেখেও চুপ করে ছিল। একটিও প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায়নি। ফলে রাজ্যে বেশিরভাগ মানুষই মনে করতেন বামপন্থীদের এইসব কুৎসিৎ দেওয়াল লিখনে সত্যতা কিছুটা আছে। অনেক অনেক পরে বাংলার মানুষ জেনেছেন বামপন্থীরা দলীয় স্বার্থে কিছু নির্দোষ ব্যক্তির চরম মানহানি করেছিল। তাই বলছি, অসত্য অশালীন ভাষায় ব্যক্তিগত আক্রমণ বামপন্থীদের কাছে কোনও নতুন বিষয় নয়। দলীয় স্বার্থরক্ষায় তারা পারে না এমন কোনও নীচ কাজ নেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল ও কংগ্রেস দলের চুনোপুঁটি নেতারাও বামপন্থীদের হার মানাচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নির্বাচনের ব্যালেটের লড়াই এবং সমাজবিরোধীদের এলাকা দখলের জন্য বুলেটের লড়াইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এখন আর নেই।

মুসলিম সংরক্ষণ

সেকাল-একাল

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।। ১৮৮২ সালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য প্রথম সরকারি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, যা হান্টার কমিশন নামে সুপরিচিত। এই কমিশনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সূচনা করে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে কমিশনের সদস্য, তৎকালীন বিশিষ্ট বাঙালী শিক্ষাবিদ-ত্রয়ী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অজ্ঞ ছিলেন। তাই নির্দ্বিধায়, সরল মনে কমিশনের সুপারিশে তাঁরা সম্মতিও দিয়েছিলেন। অথচ এই রিপোর্টের সুপারিশেই নিহিত ছিল পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের বীজ। যা ১৯৩৮ সালে মুসলিম লিগের পীরপুর

মোজা-মাপ্টা

কমিটি রিপোর্টে মহীরূপে পরিণত হয়।

মজার কথা সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর তৈরি সোয়া'শো বছরের সেই পুরানো রিপোর্টের মডেলে স্বাধীনোত্তর ভারতে ৬০ বছর পরে তৈরি হলো একটি নতুন রিপোর্ট। বহুচর্চিত এই রিপোর্টই হলো 'সাচার'। এই রিপোর্টের অনেক কিছুই স্রেফ টোকা হয়েছে হান্টার রিপোর্ট থেকে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ২০০৫ সালে সাচার কমিশন তৈরি করেছিল দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক যা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তা সংহত করা, দ্বিতীয়ত, সংঘ পরিবারের সংখ্যালঘু সংক্রান্ত প্রচারকে মোকাবিলা করার রাজনৈতিক অস্ত্র খুঁজে বার করা। কিন্তু এই কাজের দূরগামী পরিণাম কি হতে পারে কংগ্রেস সম্ভবত তা ভেবে দেখেনি অথবা ভাবলেও দলীয় রাজনীতির কানাগালি তাদের কাছে রাজবর্ত হিসাবে দেখা দিয়েছিল।

ওই সাচার রিপোর্ট ছিল সি পি এমের কাছে শাঁখের করাত। কংগ্রেসী কৌশল বুঝতে পেরেও অসহায় ভাবে দিল্লীর গোপালন ভবন থেকে তড়িঘড়ি এই রিপোর্টকে সমর্থন জানানো হলো। কিন্তু কলকাতার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ইভেন্ট ম্যানেজাররা প্রমাদ গুণে এই রিপোর্টকে একপেশে বলে অভিহিত করলেন। কারণ এই রিপোর্টে মোদীর সাম্প্রদায়িক গুজরাটকেও মুসলমান সমাজের উন্নয়নে বামফ্রন্টের সাম্যবাদী বাংলার থেকে অনেক বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে। মুখে সমালোচনা করলেও বাংলার সুচতুর শাসকদল আগামী বিপদের দেওয়াল লিখন পড়তে

(এরপর ৪ পাতায়)

গরীব হিন্দুদের বঞ্চিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা ঃ মালদা।। গত ১০ ও ১১ এপ্রিল দুদিনের সফরে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মালদা সফরে এসেছিলেন। মালদা কলেজ-অডিটরিয়ামে 'আমার বাড়ি' প্রকল্পের সূচনা করে তিনি বাড়ি তৈরির জন্য সম্পূর্ণ অনুদান হিসাবে বেশ কয়েকজন সংখ্যালঘু মহিলাকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা করে দেন। এছাড়া মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ৫৮৬ জনকে ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা পড়াশুনার জন্য, ব্যবসা করার জন্য

সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম পর্ষদের পক্ষ থেকে ১১২ জনকে ৬৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা তুলে দেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, 'আমার বাড়ি' প্রকল্প হিন্দুদের বা তপশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য কেন রূপায়িত করা হলো না? তাদের মধ্যে কি গরীব নেই? গরীব মুসলিমদের জন্য বাড়ি তৈরিতে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালতে পারলেও হিন্দু জনজাতিদের বেলায় নয় কেন? মালদা জেলাতে কয়েক লক্ষ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী রয়েছে যারা রাজনৈতিক দলগুলির প্রচ্ছন্ন মদতে রেশনকার্ড ও ভোটার লিস্টে নাম তুলে এখন এদেশের নাগরিক হয়ে গেছে। এদেরই বেশির ভাগ অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া কোটি কোটি টাকা নিয়ে এরাই আমাদের দেশের গরীব মুসলিম ও জনজাতিদের অন্নে থাবা বসাচ্ছে। অথচ কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা মুসলিমদের এই তোষণে একটি কথাও বললেন না।

সমীক্ষাতে দেখা গেছে মালদা জেলায় মুসলিমরা মাছ ধরার কাজে, দরজির কাজে, রেশম চাষ ও শ্রমিকের কাজে হিন্দুদের চাইতে অনেক এগিয়ে। সেই তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে গরীবের সংখ্যা বেশী ও তারা পিছিয়ে রয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী কেবল মুসলিমদের ধর্মীয় ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করে

(এরপর ৪ পাতায়)

চিরায়ত সাহিত্য সংরক্ষণে উদ্যোগী ইনফোসিস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। চিরায়ত সংস্কৃত, বাংলা, তামিল, কন্নড়, পাঞ্জাবী এবং অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের দ্বিভাষিক মুদ্রণ এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি এব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন প্রখ্যাত সফট্‌ওয়্যার নির্মাণ সংস্থা ইনফোসিস-এর সর্বময় কর্তা নারায়ণ মূর্তি। অবশ্য এই কঠিন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-কে। এজন্য শ্রীমূর্তি এবং তাঁর সহধর্মিনী ৫.২ বিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যেই হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করেছেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত ওইসব মূল্যবান বইগুলি সংরক্ষিত থাকবে ভারতের 'মূর্তি ক্লাসিক্যাল লাইব্রেরি'তে। হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ এইসব গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়াতে খুবই আনন্দিত হয়েছেন, মূর্তি দম্পতি—নারায়ণ এবং সুধা মূর্তি। ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যকে সারস্বত বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পেরে তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ইতিমধ্যে এধরনের কাজ করেছে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায়। ২০০৫ সালে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস এরকম অনেক বই মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছে। তবে মূর্তি ক্লাসিকাল লাইব্রেরি-র কাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের টীকা, ব্যাখ্যা, ভূমিকাও থাকবে মূল পুস্তকের সঙ্গেই। এইসব বিশেষজ্ঞদের একজন হলেন এবছরে পদ্মশ্রী প্রাপ্ত সংস্কৃত বিদ্বান সেলডন পোলক। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এবং 'এশিয়ান স্টাডি' বিষয়ের তিনি অধ্যাপক।

নারায়ণ ও সুধা মূর্তি

হার্ভার্ডের অধ্যাপক নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন এই প্রকল্পকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বে এক বৌদ্ধিক শূন্যতা থেকে গিয়েছে। যে কারণে বিশ্বের সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য বিষয়ে অজ্ঞতা রয়েছে এবং তা আজ এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই ফাঁক পূরণে এগিয়ে এসেছে মূর্তি ক্লাসিকাল লাইব্রেরি। তারা এই চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। আজকের পৃথিবীতে ভারতীয় চিরায়ত ধ্রুপদী সাহিত্যকৃতি বিষয়ে অজ্ঞতা দূর করা প্রয়োজন।'

২০১৩-র মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে এবং ছাপার আকারে ছাড়াও ডিজিটাল প্রযুক্তিতেও ভারতীয় সাহিত্যের এইসব মহামূল্যবান গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

হিন্দুত্বের অবমাননা

সেকুলারিজমের মাসুল গুণছে নিরীহ একটি বই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মকবুল ফিদা হুসেন নগ্ন সরস্বতীর ছবি আঁকলে সেটা হয় শিল্পোৎকর্ষতার চরম পরাকাষ্ঠা আর অন্যদিকে মুসলিম সমাজের প্রতিচ্ছবিতে মৌলবাদ-নিস্পৃহ রঙ মেশালেই হয়ে যায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা; কিংবা ইসলামকে অপমান করার অজুহাত। সব মিলিয়ে যা হলো সেকুলারিজম নামক ইংরেজি শব্দগুচ্ছের অক্টোপাসে আটকা পড়ার স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ঐতিহ্য। এহেন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিকতম নিদর্শন—২০০৭-এর মার্চ মাসে মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়া একটি পুস্তক, নাম 'আ কনসেপ্ট অব্ পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ড ইনভেশন বাই মুসলিমস,' যার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তের কথা গত ১৬ এপ্রিল ঘোষণা করেছে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। বিচারপতি পি সত্যশিবম এবং এইচ এল দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ বইটির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমরা দেশের মানুষের আগ্রহ ও শান্তির ব্যাপারে সজাগ রয়েছি...আমরা আমাদের দেশের নাগরিকদের এই ধরনের বই পড়ার ব্যাপারে অনুমতি দিতে পারি না। কারণ, এখানে ইসলামকে খুব বাজে ভাবে দেখানো হয়েছে (সোয়িং ইসলাম ইন ব্যাড লাইট)।' কোর্টকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বইটির লেখক আর ডি ভাসিন বলেছেন—'এই ধরনের বই নিষিদ্ধ করার কোনও ভিত্তিই নেই মহারাষ্ট্র সরকারের। বইটির দশ হাজার কপি বিক্রয় হয়ে যাবার পরে তা নিয়ে কোনও ঝামেলাই হয়নি।

শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে এই কর্মটি করেছে সরকার। আর সুপ্রিম কোর্ট বইটি সম্পর্কে রায় দিতে গিয়ে যা বলেছে তা দেশের মানুষের বাক্-স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।''

প্রকৃতপক্ষে বইটিতে যা লেখা রয়েছে বা যেভাবে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা মোটেও ইসলাম বিরুদ্ধ নয়। বইটিতে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণ ও সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে যা সমাজের অনেক বিশিষ্ট মানুষ-জনই স্বীকার করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, বইটিতে ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখানো হয়েছে যা বহুশ্রুত। তৃতীয়ত, আজকের সমাজে সন্ত্রাস ও নৃশংসতা চালানোর মূল কারিগর যে মুসলমানেরাই তা লেখা হয়েছে বইটিতে। এই তত্ত্বও সর্বজনস্বীকৃত। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে এই নিষেধের পেছনে স্বার্থান্বেষী কে বা কারা?

গুরুগোবিন্দ সিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনপত্রে হিন্দুরা এখন অন্যদের দলে?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি গুরুগোবিন্দ সিংহ ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জি জি এস আই পি ইউ) ভর্তির আবেদন পত্রে হিন্দুদের অন্যান্যদের দলে ফেলা হয়েছে। হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় পরিচয় জানানোর জন্য সেখানে কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সেখানে শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় জানানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক চিহ্ন (স) দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। হিন্দুদের জন্য তেমন কোনও উল্লেখ নেই। পরিবর্তে তাদের জন্য 'অন্যান্য' (others) শীর্ষক একটি কলমে ঠিক চিহ্ন (✓) দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় জানানোর জন্য কোনও সুযোগ রাখা হয়নি। তারা অন্যান্যের দলে। এর ফলে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংশয় এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডি কে বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে ভর্তির আবেদনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে এবং হিন্দুদের জন্য 'অন্যান্য' কলমে তাদের ধর্মীয় পরিচয় দিতে বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য এতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। হিন্দুরাই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই আবেদন পত্রে সংখ্যালঘু/ এস সি/এসটি/ও বি সি এবং অন্যান্যদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা রয়েছে। হিন্দুরা যেহেতু এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই 'অন্যান্য' কলামে তারা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় জানাবে।

উপাচার্যের এই সাফাইয়ে অনেকেই ভুরু কুঁচকেছেন। রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতার গদি দখলের সংকীর্ণ স্বার্থে সংখ্যালঘু তোষণে যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, গুরুগোবিন্দ সিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাজের পেছনে অনেকেই তাই হিন্দুদেরকে অবহেলা করার ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - ২০০্

এই সময়

হামলা বাড়ার আশঙ্কা

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের ওপর পুনরায় হামলার আশঙ্কার কালো ছায়া। সৌজন্যে—অস্ট্রেলিয়া কেন্দ্রিক ডেইলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'ম্যাক্রোপ্ল্যান অস্ট্রেলিয়া' নামক জনসংখ্যা বিষয়ক পরামর্শদাতা একটি সংস্থার প্রতিবেদন। যে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ভারতীয়রা আগামী পনেরো বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। গত ১৮ই এপ্রিল প্রকাশিত সংবাদে দাবী করা হয়েছে এশিয়ার দু'টো দেশ বিশেষ করে ভারত ও চীন থেকে প্রচুর মানুষ ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বিশেষ করে, এঁদের মধ্যে ভারতীয়রা সেদেশে উচ্চপদে বহাল রয়েছেন। কূটনৈতিক মহলের আশঙ্কা, আগামীদিনে অস্ট্রেলিয়-বংশোদ্ভূতরা নিজদেশেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আশঙ্কায় ভারতীয়দের ওপর ফের আক্রমণ চালাতে পারে।

সহ্য-শক্তি

সহ্য-শক্তির নিরীখে যদি নোবেল পুরস্কারের প্রচলন থাকত, তবে জনৈক কাশ্মীরি পণ্ডিত রাকেশ বা তাঁর মতো অনেক পণ্ডিতকে এই পুরস্কার প্রদান করা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকত না। হাতে গোনা যে কয়েকজন কাশ্মীরি পন্ডিতের ঘরে ফেরার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে রাকেশ অন্যতম। দীর্ঘ ষোলো বছর বাদে উত্তর-কাশ্মীরে নিজের বাড়িতে ফিরে তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর বাড়ির মাথায় যে চক্রটি লাগানো ছিল তা উধাও হয়ে গেছে, এর পর আরও চমক। তাঁর বাড়ি, জমি তো বটেই সেইসঙ্গে গ্রামের একটি ঐতিহ্যমন্ডিত জায়গা যা বরাদ্দ ছিল হিন্দু ও শিখদের পারলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্য তার পুরোটাই দখল করে নিয়েছে মুসলিম মাফিয়ারা। সহ্য-শক্তির পরীক্ষায় সেন্ট পার্সেন্ট মার্কস নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ রাকেশরা।

লঙ্কাস্ত্র

সন্ত্রাসবাদকে পরাস্ত করতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মস্তকে নবতর অস্ত্রের পরিকল্পনা এসেছে। সেই অস্ত্রের ইতি-বৃত্তান্তে যাবার পূর্বে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যের সংযোজন করা হলো। ২০০৭ সালে গিনেজ বুক্ অব্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে 'ভূত জোলকিয়া' নামক লঙ্কার একটি প্রজাতি ঝালের কারণে স্থান পায়। সোজা কথায় ওই প্রজাতির লঙ্কা খেলে ভূত পর্যন্ত পালাতে বাধ্য, তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঝাল লঙ্কাটির এহেন নামকরণ। একমাত্র ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বে এই লঙ্কার প্রভূত পরিমাণ চাষ হয়। সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এই লঙ্কার প্রয়োগ-পদ্ধতি চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এই লঙ্কাকাণ্ডে চোখের জলে-নাকের জলে এক হয়ে বিপক্ষ পরাজিত হবে, এমন ভাবনাই ভাবছে সেনাবাহিনী। সঙ্গে উপরিপাওনা এই লঙ্কার গুণে পাকস্থলীর সমস্যা দূরীভূত হয় ও গরম রোদে যুদ্ধ করার সময় কিছুটা হলেও তা স্বস্তি এনে দেয়।

উদ্ধার পদ্ম-মন্দির

বৌদ্ধধর্মের স্থাপত্যকর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লোটাস টেম্পল বা পদ্ম-মন্দিরের সন্ধান মিলল মধুপুরের পথে নরসিংদির ওয়াবি-বটেশ্বরে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উদ্ধার হওয়া এই মন্দিরের বয়স প্রায় চৌদ্দশ বছর। অন্তত এমনটাই মনে করছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। তাঁদের মতে, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় ইঁটের গাঁথনি দিয়ে গড়ে ওঠা এই মন্দিরটিতে ইঁটের আকৃতি ও আয়তন এবং অন্যান্য নিদর্শন প্রমাণ করছে শিবপুরের ধুপিরটেকে মন্দিরভিটা জেলায় বৌদ্ধ-বিহারের অস্তিত্ব ছিল।

আবার আসিব ফিরে

জমজমাট মেগা-ইভেন্ট। যাঁরা এতদিন আই পি এল-কে স্রেফ চিত্র-তারকাদের বিনোদন বলে উড়িয়ে দিতেন, আই পি এল এবার তাঁদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। বিনোদন তো বটেই, কিন্তু তার মধ্যে যে রাজনীতিকদের হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, খেলোয়াড়দের মান-অভিমান লুকিয়ে আছে তাঁর খোঁজ কে রাখত? এবারে বান্ধবী সুনন্দা পুস্করকে নিয়ে বিতর্কের কারণে মন্ত্রীত্বের চাকরি গেল শশী থারুরের, রাজনৈতিক ডামাডোলে বেজায় বিপাকে পড়ে আই পি এল চেয়ারম্যানের চাকরি যায় যায় অবস্থা ললিত মোদী-র। এদিকে নাইট (বানানটা কে এন আই টি ই)-দের হয়ে একাই লড়লেন দাদামণি, স্রেফ 'আমার নাম খানে'র জন্য। সবশেষে আবেগমথিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—আবার আসিব ফিরে, (সামনের বারে)। এহেন সার্বিক বিনোদনের (চিত্রতারকা কিংবা চিয়ারলিডার্সদের যার ওপর এবারে অন্তত কোনও 'পৈতৃক নিয়ন্ত্রণ' নেই) পর কোনও নিভৃতচারিণী হয়তো গাইবেন—সখী বেলা না যেতে, খেলা তব কেন যায় ঘুচে?

রাহু-কেতুর মিলন

নতুন দিল্লীর তিহার জেলে সম্প্রতি মিলিত হলেন হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানী ও দেশের সংসদীয় ভবনে হামলার ঘটনায় যুক্ত ফাঁসির আসামী ওই জেলে বন্দী মহম্মদ আফজল গুরুর সঙ্গে। সন্ত্রাসবাদের এই রাহু-কেতুর মিলনে ঘোর অমানিশার আশঙ্কা করছেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। কাশ্মীরের পয়লা নম্বরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গিলানী যিনি সোপর কান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে আফজল গুরুর বাড়িও কিন্তু সোপরে। এহেন একজন ফাঁসির আসামী-কে গিলানী 'নিরপরাধ' শংসাপত্র দিয়ে গেলেন গত ১৭ এপ্রিল। কাশ্মীরে এর পরেও শান্তি ফিরবে আশা করে কোন মূর্খে?

কোথাও মৃত্যু, কোথাও দুঃখ

দক্ষিণবঙ্গে চলছে তীব্র দাবদাহ, আর উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন রাজ্যে ঘূর্ণিঝড় টর্নেডো-র প্রকোপ। যার নিদারুণ ফলশ্রুতি শুধুই মানুষের মৃত্যুতে সীমাবদ্ধ। ঘূর্ণিঝড়ে মৃত শতাধিক, গৃহহারা সহস্রাধিক। অন্যদিকে 'লু'-লেগে দক্ষিণবঙ্গেও মৃত্যুর খবর আসছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং আজ বিশ্বকে শাঁখের করাতে পরিণত করেছে। যেতেও কাটছে, আসতেও কাটছে। তাই বর্ষার আশায় রৌদ্রদগ্ধ যাঁরা চাতকের ন্যায় আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন সেই বৃষ্টিই হয়তো ঝড়ের মেঘের মতো ধেয়ে এসে তাদের জীবনকে আঁধারাচ্ছন্ন করে দেবে। আর যারা বর্ষণসিক্ত অবস্থায় রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের আশা করছেন প্রখর তপন তাপ হয়তো জীবনের অমোঘ সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ক্রিকেট বাণিজ্য ও সীমাহীন দুর্নীতি

বিখ্যাত ক্রিকেট লিখিয়ে নেভিল কার্ডাস মহাশয় একবার ক্রিকেটীয় স্কোরবোর্ডকে গাধা বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার মনে হইয়াছিল কোনও ক্রিকেট খেলিয়ে যাহা খেলেন, স্কোর বোর্ডে প্রায়শই তাহা দৃশ্যমান হয় না; উপরন্তু তাহার বিপরীতটিই ফুটিয়া উঠে। তিনি আজিকার দিনে জীবিত থাকিলে এবং মানসনেত্রে 'ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ' নামক ক্রিকেটীয় সার্কাসটিকে অবলোকন করিলে তাহাকে গর্দভের তকমাও দিতে চাহিতেন কিনা তাহা লইয়া সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। কারণ ইহাতে ক্রিকেট নামক ক্রীড়া-কৌশল ব্যাতিরেকে আর সব কিছুই প্রদর্শিত হইতেছে।

২০০৮ সন নাগাদ ভারতীয় ক্রিকেট-ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য যখন নিলামের আয়োজন হইয়াছিল, তখন আপামর ভারতবাসী অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে বিসিসিআই-এর অর্থবান ক্রীড়াদণ্ড ধনিকের মানদন্ডে পরিণত হইয়াছে। আর ২০১০ সনে ভারতবাসী বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলেন ধনিকের সেই মানদণ্ড রাজদণ্ডে আঘাত করিতেও সক্ষম হইয়াছে। এই মানদণ্ডটি হইল আই পি এল। বলাই বাহুল্য ক্রিকেট এস্থলে ব্রাত্য। বাণিজ্যে যে ইহা নিদারুণ সফল তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হইল ২০০৮-এর নিলামে ৮টি দলকে ক্রয় করিতে সব মিলিয়ে মালিকপক্ষ যে পরিমাণ টাকা ঢালিয়াছিলেন, তাহার ঠিক বৎসর দুই পরে মাত্র দু'টি দলকে ক্রয় করিতে মালিকপক্ষ তাহার চাহিতেও বেশী মুদ্রা ব্যয় করিলেন। স্মরণে রাখা দরকার, যাহারা এইসব ফ্রাংচাইজিগুলি ক্রয় করিতেছেন তাহারা কেহই নাবালক নহে। প্রত্যেকেই ধুরন্ধর ব্যবসায়ী। তাহারা দানছত্র খুলিয়া বসেন নাই। ব্যবসায় প্রভৃত লাভালাভির ব্যাপার না থাকিলে তাঁহারা কখনওই এখানে নাক গলাইতেন না। সেই কারণেই বিগত দুই বৎসরে অভিজ্ঞ ভারতীয় ক্রিকেটারদিগের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখের হয় নাই। যেমন—বেঙ্গালুরুর দলনায়ক রাহুল দ্রাবিড়কে টীমের পরাজয়ের কারণে অধিনায়ক থাকাকালীন মালিক বিজয় মালিয়ার রোষে পড়িতে হইয়াছিল ও তাহার অব্যবহিত পরে দলনায়কের পদে ইস্তফাও দিতে হইয়াছিল। গত বৎসর নাইট মালিক শাহরুখ বঙ্গসন্তান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত জন বুকাননকে শিখন্ডী খাড়া করিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা ভারতবাসী মাত্রেই অবগত রহিয়াছেন। 'আইকন' ক্রিকেটার যুবরাজ সিং, মহম্মদ কাইফ, এমনকী ভি ভি এস লক্ষণের মতো 'শীতল মস্তিষ্কে'র ক্রিকেটারও উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হন নাই। অর্থের নিকট পরাজিত হইয়া প্রাক্তন ভারতীয় টেস্ট অধিনায়কগণও যথোচিত সম্মান পান নাই ফ্রাংচাইজি মালিকদের নিকট হইতে। ক্রিকেটীয় দক্ষতা লইয়া শাহরুখ খান যে অর্বাচীনের ভঙ্গিমায় প্রবাদ প্রতিম ভারতীয় ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরের সহিত তর্ক জুড়িয়াছিলেন তাহাতে ক্রিকেট-দেবতাই অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাণিজ্য এক বস্তু, অপরাধ বাণিজ্য আরেক বস্তু। লক্ষ কোটি কোটি টাকার খেলায় অস্বচ্ছতা থাকিবে না এই কংগ্রেসি রাজত্বে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা এখনও সেই পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। শশী থারুর আই পি এল কেলেঙ্কারী নাটকের নিতান্ত এক কুশীলব মাত্র, নায়ক-নায়িকারা আপাতত অন্তরালেই রহিয়াছেন। তবে খলনায়ক হিসাবে আই পি এল চেয়ারম্যান ললিত মোদীর উদয় হইয়াছে। আপাতত তাহার গদি বাঁচানোই দায়। জনগণের আঞ্চলিক সেন্টিমেন্টকে উস্কাইয়া দিতে রাজ্যের রাজধানী শহরের নামে ফ্রাংচাইজিগুলির নামকরণ করা হইত। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু রঁদেভু স্পোর্টস ক্লাবও নিলামে তাই কোচি নাম্নী ফ্রাংচাইজিটির মালিক হইয়াছিল। পরে ইহা লইয়া শশী থারুর যেমন বিপদে পড়িয়াছিলেন, একইভাবে ললিত মোদীও ইহা লইয়া ঠিক ততটাই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন। এমনকী, আই পি এল অফিসে আয়কর আধিকারিকদের হানার গঞ্জনাও সহিতে হইয়াছে মোদীকে। মোদীকে রক্ষা করিতে আসরে আবির্ভূত হইয়াছেন শারদ পাওয়ার, বলা যাইতে পারে তিনিই নাটকের মূল কুশীলব। মোদী শিখন্ডী মাত্র। মোদী বিপদে পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ রঁদেভু স্পোর্টসের বিপক্ষে অভিযোগ করিয়া বসিলেন যে ওই ফ্রাংচাইজির কেহ কেহ নাকি কোচির পরিবর্তে আমেদাবাদ নামকরণের নিমিত্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। জনগণের প্রাদেশিকতার সুপ্ত অভিমানকে জাগ্রত করিতে এই রাজনীতিকদিগের এহেন প্রচেষ্টা বিন্দুমাত্র শুভ ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিবে না।

আই পি এলের তাড়নায় টেস্ট ক্রিকেটের গরিমা অস্তাচলগামী। ক্রিকেটের ধ্রুপদ আঙ্গিক দেখিবার পরিবর্তে বলিউডি নায়ক-নায়িকার সঙ্গে নৃত্য করিতে কিংবা চিয়ার-লিডার্সদের নৃত্য দেখিতেই জনসাধারণ বিপুল উৎসাহিত বোধ করিতেছেন। মিডিয়াকুলও তাহাতে উৎসাহ যোগাইতেছেন। সীমাহীন দুর্নীতি এজাতীয় মানসিকতার প্রতি জনগণকে কতটা বীতস্পৃহ করাইতে পারিবে আগামীদিনে তাহার দিকে উৎসুক নয়নে চাহিয়া থাকিবেন ক্রিকেট-দেবতা।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমরা পুণ্যতীর্থ ভারতজননীর সন্তান। শস্যশালিনী আমাদের জন্মভূমি সম্পদে বল, সংস্কৃতে বল, কতই না গরীয়ান, কত গৌরবময়। এই পুণ্যভূমিতেই ঋষিগণ সামস্তোত্র গান করিতেন। বেদান্ত উপনিষদ ব্যাখ্যা করতেন, মুক্তির বার্তা বহন করতেন। এই ভারতভূমি পরম অধ্যাত্মবাদের পুণ্যক্ষেত্র, এখানকার দর্শন বিজ্ঞান মানবজীবনের দুঃখ বেদনা হরণ করিয়া পরম শান্তি প্রদান করে সমগ্র পৃথিবী এই প্রাচ্য ভূমির নীতি ও আদর্শে সঞ্জীবিত। এখানকার ধর্মমতই একদা চীন, জাপান প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ক্রমে আমাদের শিষ্যগণ গুরুকেও অতিক্রমের চেষ্টা করিয়াছে। তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ কিরূপে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব তাহারা তাহা দেখিয়াছে।

—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বামফ্রন্ট সরকার ও মাদ্রাসা শিক্ষা

দেবজ্যোতি রায়

বাংলাদেশের মুক্ত মনের মানুষ সালাম আজাদ বলেন—"মাদ্রাসা থেকে যে লাখ লাখ ছেলে মেয়েরা বেরুচ্ছে তারা তো পঙ্গু,...বাঙালী জাতির জন্য ভয়ঙ্কর। কারণ তাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে বের করা হচ্ছে, মুসলমান হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে মুসলমান খুন করুক, ধর্ষণ করুক, রাহাজানি করুক, তবুও সে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান বলেই শ্রেষ্ঠ। তাদের যে কাল্পনিক বেহেস্ত রয়েছে সেই বেহেস্তে মুসলমান ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই। আর যে মুসলমান নয়, সে কাফের। কাফের হত্যা করলে পাপ নেই। বরং পুণ্য। বেহেস্ত কাফের হত্যাকারীর জন্য উন্মুক্ত। এ সবই তো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে।" (সালাম আজাদের 'ভাঙা মঠ', জুন, ০৪, পৃ-৫৪, বাইণ্ডিং সংস্করণ।)

বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী কমরেড অসীম দাশগুপ্ত গত ২২.৩.২০১০ তারিখে আগামী বছরের রাজ্য বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে খরচের বরাদ্দ বাড়িয়ে গত বছরের তুলনায় এ বছর আড়াই গুণ করে দিয়েছেন, ১২১ কোটি থেকে ৩০০ কোটি টাকা। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, মাদ্রাসাগুলোতে ভোকেশনাল এবং টেকনিক্যাল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সার্বিক ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটানো হবে, যাতে সংখ্যালঘু সমাজের ছাত্র-ছাত্রীরা চাকুরী ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পায় এবং তাদের আয় বাড়ে।

মাদ্রাসা জিনিসটা কি? সেখানে কি কি বিষয় পড়ানো হয়? সেখানে এখন যা পড়ানো হয়, তার মধ্যে ভোকেশনাল এবং টেকনিক্যাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে 'যে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার সৃষ্টি' তার কতটুকু পরিবর্তন হবে? ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলাম প্রেমিক খাঁটি মুসলমান না হয়ে কতটুকু খাঁটি ভারত প্রেমিক মানুষ হবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার উদ্দেশ্যে এই নিবন্ধের অবতারণা।

মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরান, হাদিস এবং ইসলামের ইতিহাস (যার অনেকটাই মনগড়া) শিখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাক্কা মুসলমান তৈরি করা। ক্ষেত্র বিশেষে 'জেহাদী মুসলমান' তৈরি করা। বামপন্থী বুদ্ধি জীবীরা এ সব জানেন না, তা হতে পারে না। জানেন; অবশ্যই জানেন। তা হলে এ সব ধবংসাত্মক কাজ তারা করছেন কেন?

জন্মলগ্ন থেকে ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের বামপন্থী নেতা-কর্মীরা সহস্র কণ্ঠে বলতেন 'ধর্ম জনগণের আফিম'। আফিম যেমন মানুষকে বেশ কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান করে রাখে, ধর্ম আফিম তার চেয়ে হাজার গুণ সময় ধরে মানুষকে অজ্ঞান করে রাখে। এর ফলে শোষক সমাজ তাদের শোষণের কাজ নিরাপদে চালিয়ে যেতে পারে। অনেক কমিউনিস্টদের মতে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে শক্তিশালী আফিম। এই আফিম খাইয়ে কোটি কোটি শ্রমজীবী সাধারণ মুসলমানকে শোষণ করছে মুষ্টিমেয় মুসলিম শাসক এবং তাদের চামচে মোল্লা-মৌলভীরা। তাই কমিউনিস্টরা নিজেরা কোনও ধর্ম পালন করবেন না এবং সাধারণ মানুষকে ধর্মাচরণে নিরুৎসাহিত করবেন। তারা ক্ষমতায় গেলে সরকারী তহবিল থেকে ধর্মীয় খাতে এক পয়সাও খরচ করবেন না, তা সে ইসলাম, হিন্দু বা যে কোন ধর্মই হোক না কেন।

বামফ্রন্ট ক্ষমতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ২৩৮টি। তারপর আজ পর্যন্ত বামফ্রন্ট আরও ২৬৯-টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাহলে এখন সরকার-স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০৭-টি। অদূর ভবিষ্যতে আরও ৫০০-টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে আমাদের 'চোখের মণি' নাস্তিক দর্শনে বিশ্বাসী' বামফ্রন্ট সরকার। এর বাইরে অর্থাৎ স্বীকৃতিবিহীন মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০০০-এর কম নয়। এগুলিকে বলা হয় খারিজি মাদ্রাসা। এর বাইরেও আছে হাজার হাজার অলিখিত মাদ্রাসা। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এগুলো আবার কি? এগুলো হচ্ছে 'মসজিদ'। কমিউনিস্ট, বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় 'খোদার ঘর'। আমাদের রাজ্যে এরূপ কতগুলি খোদার ঘর আছে, সম্ভবত স্বয়ং খোদা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না। প্রতিটি মসজিদই কিন্তু এক একটি মাদ্রাসা। ঘোষিত মাদ্রাসায় ১২ বছর ধরে যা শেখানো হয়, তার 'ক্রিম' শেখানো হয় মসজিদ নামের অঘোষিত মাদ্রাসায় প্রতি শুক্রবার খুতবা পাঠের মাধ্যমে। ঈদের সময় হয় বিশেষ খুতবা। একটু পরে আমরা একটি খুতবার বয়ান উল্লেখ করব।

১৯৭৭-এ মাদ্রাসা খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ লাখ ৬ হাজার টাকা। ২০০০-২০০১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৫ কোটি টাকায়। আজ হলো ৩০০ কোটি। আসুন এক ঝলকে আমরা দেখে নিই যে মাদ্রাসার জন্য এত টাকা বরাদ্দ করা হলো সেই মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের কি কি শেখানো হয়। যা শেখানো হয় তাতে ভারত কতটা শক্তিশালী হতে পারে। কিংবা কমিউনিজম কতটা পোক্ত হতে পারে।

দুনিয়ার সর্বত্রই মাদ্রাসা শিক্ষার মূল বিষয়গুলি হচ্ছে—

১। অন্তর দিয়ে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে কোরান পাঠ।

২। পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা।

৩। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা।

৪। শরিয়তি (মুসলিম) আইন।

৫। মহানবীর পবিত্র জীবনী ও বাণী (হাদিস)।

৬। মুসলিম দর্শন।

৭। প্রাথমিক অঙ্কশাস্ত্র।

৮। আল্লার বাণী প্রচার মাহাত্ম্য (তবলীগ)।

মাদ্রাসায় ইসলামের যে সব বিধি-বিধান শেখাতেই হবে তার কয়েকটি হচ্ছে—

(ক) ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। ইহা আল্লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

(খ) মুসলমানরাই সমস্ত জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অন্য ধর্মের লোকেরা কাফের। হিন্দু এবং অন্যান্য পুতুল পূজারীরা অপবিত্র।

(গ) নবী মহম্মদ মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন এই নবী মহম্মদ। তাঁর চরিত্র নিষ্কলুষ। মানব জাতির মধ্যে তিনিই একমাত্র আদর্শ পুরুষ।

(ঘ) সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি হলেন স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের আলো। তার মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন কেউ নেই। তিনি পবিত্রতম একক সত্তা; সর্বশক্তিমান। তার কোনও অংশীদার নেই। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র শরীক বা অংশীদার আছে' এমন কথা বলা। অন্য সব পাপের ক্ষমা আছে; কিন্তু এই পাপের কোনও ক্ষমা নেই।

(ঙ) এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্ এবং তার রসুল পবিত্র মহানবী।

(চ) এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক এবং পৃথিবীকে শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র নেক (সৎ) বান্দাদের। অর্থাৎ মুসলমানদের।

(ছ) সমগ্র পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে—দারুল ইসলাম ও দারুল হারব। যে

(এরপর ১৩ পাতায়)

"

এখন সরকার-স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০৭-টি। অদূর ভবিষ্যতে আরও ৫০০-টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে আমাদের 'চোখের মণি' নাস্তিক দর্শনে বিশ্বাসী' বামফ্রন্ট সরকার। এর বাইরে অর্থাৎ স্বীকৃতিবিহীন মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০০০-এর কম নয়। এগুলিকে বলা হয় খারিজি মাদ্রাসা। এর বাইরেও আছে হাজার হাজার অলিখিত মাদ্রাসা। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এগুলো আবার কি? এগুলো হচ্ছে 'মসজিদ'। কমিউনিস্ট , বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় 'খোদার ঘর'।

"

মুসলিম সংরক্ষণ সেকাল একাল

(১ পাতার পর)

পেরেছিলেন। তাই বেশ পিছিয়ে থেকে দৌড় শুরু করলেও, এ প্রতিযোগিতায় তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক চুল জমি ছাড়তেও রাজি ছিলেন না। সে কারণেই এ বাংলায় আবারও তোষণমূলক রাজনীতির এক প্রতিযোগিতার সূচনা হলো যা নতুন কিছু নয়, শতাব্দীপ্রাচীন একটি বই এর পুনর্মুদ্রণ। কপিরাইট ফুরোলেও যার চাহিদা এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও ক্রমবর্ধমান।

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ২০০৭ সালে রাজ্য সরকার কলকাতায় মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। আলিয়া নামক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিলটি বিধানসভায় পাশ হয়েছে তা দেখলে চমকে উঠতে হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পদের নাম ওই বিলে আরবিতে লেখা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আচার্য সেখানে আমির-ই-জামিয়া, উপাচার্য সেক-ই-জামিয়া, রেজিস্ট্রার—মুসাজ্জিল, ফিনান্স কমিটি—মজলিস-ই-মলিয়ত ইত্যাদি। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সরকারি অর্থে স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আই টি ছাত্র বা একজন ইতিহাস পড়ুয়া তিনি যাই অধ্যয়ন করুন না কেন, তাকে এখানে বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা নিতেই হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকটিও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে অঙ্কিত। খেজুরগাছ, বাঁকা চাঁদ আর কোরানের ছবি এখানে খোদিত। বাঙালী তথা ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি বহির্ভূত এই ধরনের প্রতীকের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আইনসভা বা অন্য কোনখানে আমরা এখনও কোনও আলোচনা হতে দেখিনি। অথচ ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক নির্বাচনের বিশেষজ্ঞ সমিতি (যার সদস্য ছিলেন স্টেলা ক্রামরিশ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়দের মতো ব্যক্তিত্বরা) যখন ভারতীয় সংস্কৃতির দ্যোতক 'শ্রী ও পদ্ম' যুক্ত প্রতীক নির্বাচিত করে তখন সে বিষয়ে বাঙলা জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। হিন্দুয়ানির ধুয়ো তুলে সে সময় বিধানসভার দলমত নির্বিশেষে মুসলমান সদস্যরা এই প্রতীক বাতিলের দাবী জানায়। শিক্ষা বাজেট বিতর্কে এর জন্য শাস্তিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই এর দাবীও ওঠে। বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়-এর পক্ষে সেদিন হিন্দু সদস্যরা প্রায় কেউই কোনও কথা বলেননি। সবার মনেই ভয় ছিল এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সমর্থন করলে তিনি হয়তো সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত হবেন। শেষ পর্যন্ত সুরাবর্দী এণ্ড কোং-এর চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতীক পরিবর্তন করে। তিয়াত্তর বছর আগে বিধানসভায় নিজের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষা করতে গিয়ে যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষাবলম্বন করতে সাহস পাননি, তাঁদেরই উত্তর পুরুষরা আজ তিয়াত্তর বছর পর নিজেদের সেই একই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের সতীত্ব রক্ষা করতে গিয়ে বিদেশী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পেয়েছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি তাই বেশ গোলমেলে।

১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তনে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ প্রথমবার রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেওয়ার আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বদেশীকরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলমান ছাত্ররা সমাবর্তন বর্জন করে। এই কাজে তাদের ইন্ধন জুগিয়ে ছিল লিগ নেতৃবৃন্দ। এই ঘটনার পর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে বহু কাহিনী লেখা হয়ে গেছে। গত শতকের ষাটের দশক থেকে পূর্ব বাংলার লাখ লাখ মুসলমান, উর্দুভাষী পাকিস্তানী-রাজাকর বাহিনীর বন্দুকের নিশানা হয়েছে কেবল বাংলা তাদের মাতৃভাষা বলে। বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে সেখানে প্রাণ দিয়েছে বহু লক্ষ মানুষ। বাংলা বলার অপরাধে সে সময় ইজ্জত দিতে হয়েছে অসংখ্য মহিলাকে। শেষ পর্যন্ত বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন রাষ্ট্রেরই জন্ম হয়েছে। সেই সঙ্গেই বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বিতর্কের কবরে শেষ মাটিও পড়ে গেছে। বিস্মিত হতে হয় এত কিছুর পরও ২০০৯ সালে এসে এরাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী তথা বাঙালী সংস্কৃতির স্বঘোষিত ধারক-বাহক মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বাজেট বক্তব্যে লিখতে হয়—'সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ও ভাষাগত সংবেদনশীলতার বিষয়টিকে মাথায় রেখে রাজ্য সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে সংখ্যালঘু মানুষের ধর্মীয় ও ভাষাগত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায়। এই সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে কবরস্থানের সুরক্ষা, উর্দুভাষার বিকাশ এবং মুসলমানদের হজযাত্রাকে সহজ করে তোলার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত।'

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বাকি কথা নয় বোঝা গেল, কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের, বাংলার বুকে 'ভাষাগত সংবেদনশীলতা'-র প্রশ্ন তুলে চাকাকে উল্টোদিকে ঘোরাবার এই অপপ্রয়াস কেন? কেন গায়ের জোরে এ বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা পালটে দেওয়ার এই অপচেষ্টা? এতে প্রকৃত লাভ কাদের? কিসের জন্য এ বালখিল্য আচরণ? এক সময় যাঁরা দেওয়ালে 'মাতৃভাষা—মাতৃদুগ্ধ' লিখে আমাদের পান করাতে চাইতেন, তাঁদের মুখে আজ এ কি বাণী? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলার লিগ্‌ জমানায় উর্দু পত্রিকাগুলিকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করা হতো। আর সরকারি সহায়তাপুষ্ট সেই সব পত্র-পত্রিকা সে সময় নিয়মিত দেশ বিভাজনের পক্ষে বক্তব্য রাখত। রাজ্য সরকার ভাষা সংবেদনশীলতার প্রশ্ন তুলে আবারও সেই লিগ্‌ জামানার পরম্পরা ফিরিয়ে এনে বাংলার উর্দু পত্রিকা সমূহে আর্থিক সহায়তা শুরু করেছে। উর্দু অ্যাকাডেমির জন্য এ বছর অনুদান ৫০ লক্ষ বাড়িয়ে দেড় কোটি করা হয়েছে। কলকাতা সহ চার জেলায় উর্দুভাষায় সরকারি কাজ চালাবার জন্য সরকারি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেওয়া হচ্ছে ভাষাবৃত্তি। আগেই দেখানো হয়েছে বাঙালী মুসলমানরা আজ সম্পূর্ণই বাংলাভাষী। এ কথা বুঝেও যদি সরকারের এ রাজ্যের অবাঙালীদের মাতৃভাষা সংরক্ষণের জন্য প্রাণ কাঁদে তা হলে শুধু উর্দু কেন? ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, গুজরাটী প্রভৃতি এ রাজ্যে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক ভাষাগত সংখ্যালঘু মাতৃভাষা রক্ষায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী? সেই ভূমিকা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগের ফাটা কাঁসি বাজিয়ে উর্দুভাষার প্রসার ঘটানোর মতো দেউলিয়া রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।

১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি এবং ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্টে যথাক্রমে এদেশে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং চাকুরিতে সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত সংরক্ষণ মেনে নেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে জিন্না এই সুযোগকে আরও বিস্তৃত রূপ দিতে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য আরও অর্থ, আরও স্কুল, আরও হাসপাতাল—অনাথালয়ের দাবী জানালেন। লর্ড ব্রাবোর্ণ জিন্নার এই দাবীর সম্পর্কে বলেছিলেন—"ড্রনব্দ ক্ষম্পপ্তনন্তুম্ভ নব্দ ব্ধপ্স ক্ষজন্দ্ধন্তড় ন্তুপ্সপ্পপ্পব্ধ্রপ্তনব্দপ্প প্পপ্সজ্বন্দ্ধ ৩প্সপ্সব্রুস্তু ৩নব্ধড়্ধ"। এরপর ১৯৩৯ সালে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল মারফত অনায্য ভাবে কর্পোরেশনে হিন্দু প্রতিনিধিত্ব হ্রাস এবং সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিলের সাহায্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে সেকেণ্ডারি বোর্ডে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়।

চরিত্রগত কিছু পার্থক্য থাকলেও রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নীতি আমাদের সে সময়কার লিগ রাজত্বকেই স্মরণ করায়। যেখানে ২০০৫—০৬ সালে রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি টাকা, সেখানে ২০০৯—১০ সালে বরাদ্দ এসে দাঁড়িয়েছে ৫২৪.১১ কোটি টাকা। ১৯৭৭ সালে যেখানে মাদ্রাসার জন্য রাজ্য বাজেটে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয় সেখানে এ বছর তার পরিমাণ ৩২৪.০৫ কোটি টাকা। সাংবিধানিক কারণে সরকারী চাকুরীতে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় রাজ্য সরকার বর্তমানে সেখানে ঘুরপথে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব বাড়াবার জন্য সমস্ত ধরনের নিয়োগ কমিশন, কমিটিতে একজন সংখ্যালঘু প্রতিনিধি রাখা আবশ্যিক করেছে। ১৯৩৯-এর সেকেন্ডারী বিলের মডেলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের আওতা থেকে মাদ্রাসাগুলিকে বার করে এনে পৃথক মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন খোলা হয়েছে। রাজ্য বাজেটে থেকে থেকে পুরসভা-পঞ্চায়েত সর্বত্র এখন সংখ্যালঘু সংখ্যানুপাতে অর্থ সংরক্ষিত করা হচ্ছে। পুরসভার জঞ্জাল অপসারণ থেকে গ্রামে টিউবওয়েল বসানো সব ক্ষেত্রেই এরাজ্যে ধর্মভিত্তিক বাজেট অনুসরণ করা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের ঋণও বর্তমানে ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভাজিত হচ্ছে। রাজারহাটে ভর্তুকিতে আবাসন নির্মাণ (আধুনিক ঘেটো!) শুরু হয়েছে শুধুমাত্র এ রাজ্যের সংখ্যালঘুদের জন্য।

১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের মাধ্যমে যে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। সেখানে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীতও হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সে সময় এত কিছু ত্যাগ করেও শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হয় সেকালের পুরানো নাটক আবার নতুন করে অভিনীত হচ্ছে। একই মঞ্চে কালের সঙ্গে নট-নটীর শুধু পরিবর্তন ঘটেছে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কায়েমি স্বার্থে ভাগ করে ভোগ করার তত্ত্ব আজ আবার নতুন করে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বর্তমানে মন ভাগ করার অপপ্রয়াস চলছে, ভবিষ্যতে আবার মাটি ভাগের কথা উঠবে। ইতিহাস শুধু জানার নয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হয়। হান্টার কমিশনের সময়ে সরল মনের বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা যে ভুল করেছিলেন আজ দেশবাসী তার মাসুল গুণছে। তাই বর্তমানে আমরা আত্মবিস্মৃত থেকে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব; না ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিতব্যকে পুরুষকারের সাহায্যে বদলে দেব, সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হবে।

হিন্দুদের বঞ্চিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

(১ পাতার পর)

প্রমাণ করলেন তিনি নাকি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ! মালদায় ১৭১৫ জন মুসলিমকে কেবল বাড়ি তৈরির জন্য ১৮ কোটিরও বেশী টাকা দেবেন অথচ হরিপুরে একটি আই টি আই কলেজ স্থাপন করে জনজাতিদের জন্য শুধু গালভরা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। সেখানে সরাসরি অর্থ সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা করলেন না। আসলে মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন, হিন্দুদের চাইতে মুসলিম ভোট বেশী মূল্যবান। এতদিন মালদা জেলাতে ক্ষমতায় কংগ্রেস ও সিপিএম থাকলেও নেতারা আলাদা ভাবে মুসলিমদের জন্য এইভাবে অর্থ বরাদ্দ করতে পারেনি। যদিও সংখ্যালঘু হিসাবে দরিদ্র মুসলিম পরিবারগুলি যে কিছুই সাহায্য পায়নি' তা ঠিক নয়। কিন্তু ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুপ্রবেশের জন্য তারা শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভাতে কংগ্রেসের সভাধিপতি সাবিনা ইয়াসমিন, সাংসদ কেনজির নুর, আবদুস সাত্তার সহ মন্ত্রী শৈলেন সরকার, বিধায়ক খগেন মুর্মু, সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা কেউই দরিদ্র হিন্দু পরিবারের অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিলেন না।

মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে দরাজ হস্তে টাকা ঢালার ঘটনা হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ নয় কী? ধর্মের ভিত্তিতে এভাবে বিভেদমূলক সহায়তা কি দেশকে আরও একবার ভাগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না?

রাজ্য রাজনীতি

বুদ্ধ দেবের ডানা ছাঁটা শুরু হয়েছে

নিশাকর সোম

রাজ্যে মাওবাদী হামলার জন্য সঙ্গতভাবেই রাজ্য-পুলিশ প্রশাসন তথা রাজ্যকে দায়ী করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম রাজ্যের জঙ্গলমহল ঘুরে গেলেন। এটা শাসক-বিরোধী প্রধান গোষ্ঠীকে উদ্দীপিত করে তুললো। এর অব্যবহিত পরেই দান্তেওয়াড়াতে এক ভয়াবহ মাওবাদী আক্রমণ হলো। চিদাম্বরম পদত্যাগের নাটক করলেন। মনমোহন তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করলেন না। একের পর এক মাও আক্রমণের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্টে তাদের প্রকারান্তরে সমর্থন করলেন। কংগ্রেস মাওবাদীদের বিরুদ্ধে মোটেই কঠিন এবং কঠোর মনোভাব নিতে পারবে না। কারণটা খুবই স্পষ্ট। অন্ধ্রপ্রদেশের বিগত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মাওবাদী সীতারামাইয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে "রাজনৈতিক মউ" করে চন্দ্রবাবু নাইডুদের পরাজিত করে। একথা এক প্রাক্তন নকশাল নেতা সংবাদপত্রে লিখেছেন।

চিদাম্বরম বলেছেন, মাওবাদীদের সম্পর্কে বিগত কয়েক বছর অবহেলা করা হয়েছে। কাজেই দু-তিন বছর লাগবে এই সমস্যা সমাধান করতে। এই বক্তব্যের অর্থ হলো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের ব্যর্থতা। এ-রাজ্যেও একই অবস্থা। "মাওবাদীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবো" বলে সিপিএম সরকার কার্যত কিছুই করেনি। আদতে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এদিকে এরাজ্যে তৃণমূল এবং সিপিএম-এর দ্বৈরথ চলছে। সিপিএম হৃত জমি পুনরুদ্ধারের জন্য সশস্ত্র অভিযান চালাচ্ছে। এরাজ্যে হিংসা, অশান্তি, সন্ত্রাসের এক ভয়াবহ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য দুই যুযুধান গোষ্ঠীই দায়ী। এরই মাঝে রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব মমতা ব্যানার্জিকে সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। প্রথম সমালোচনা মমতা এবং তৃণমূলের। দ্বিতীয় সমালোচনা সিপিএম-এর পার্টির ভিতরের। বক্তব্য হলো—গৌতম দেব গাল বাড়িয়ে চড় খেলেন।

পার্টির একাংশের আরও বক্তব্য—গৌতম দেব বিরোধীদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে 'বশ' করতে চেষ্টা করে থাকেন। গৌতমবাবু তাঁর বক্তব্যে এবং মমতা ব্যানার্জিকে লেখা ১৩ পৃষ্ঠার চিঠিতে লিখেছেন—তৃণমূল নেতাদের একাংশ তাঁর সঙ্গে নিয়মিত 'হবনব' করে থাকেন। এটাই মজার রাজনীতি। উপর তলার নেতা নেতায় গলাগলি। নিচের তলার কর্মীদের খুনোখুনিতে উস্‌কানি। এসব শঠ-দ্বিচারী নেতাদের দূর করতে না পারলে সুস্থ অবস্থা ফিরে আসবে না।

এদিকে সিপিএমের শুদ্ধি করণ-এর মাথায় বাজ পড়তে চলেছে। হলদিয়াতে অশোক পট্টনায়েক সমেত প্রায় ১০ জন কর্মীর বিপুল সম্পদ কি করে হলো—সেই প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশ্ন উঠেছে লক্ষণ শেঠ এবং তস্য পুত্রের বৈভব নিয়ে। এখন তো সংবাদপত্রে বেরিয়ে গেছে যে সিকিউরিটি গার্ডদের সংগঠন মারফৎ বহু সিপিএম নেতা কামিয়ে নিচ্ছে। এতে প্রাক্তন সাংসদের নামও জড়িত আছে। এই সংগঠন সিটু ভেঙে দিয়েছে এবং তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। এই কমিশন-এর সদস্য হলেন শ্যামল চক্রবর্তী। শ্যামল চক্রবর্তীর মতে এইসব নেতাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা দরকার।

এদিকে এরাজ্যের বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলেছে। তিন দশক রাজত্ব করেও সিপিএম সরকার এই সমস্যার সুরাহা করতে পারেনি। এই অপদার্থ সরকারের বিসর্জনের বাজনা শোনা যাচ্ছে। আবার বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন নিরুপম সেন! নিরুপম সেন তো ভস্মলোচন। যেদিকে চোখ দেন সেটা ভস্মে পরিণত হয়।

সিপিএম রাজত্বে একজন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্যই তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। যেমন ডঃ অশোক মিত্রকেও সরে যেতে হয়েছিল জ্যোতি বসুর জন্য।

বিদায় বেলায় বামফ্রন্টে দু'জন নতুন মন্ত্রী এলেন। এঁদের মধ্যে সৌমেন্দ্র বেরাকে (অঞ্জন) তথ্য দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অনিল বিশ্বাস বেঁচে থাকলে অঞ্জন বেরাই শিক্ষামন্ত্রী হতেন। অঞ্জন বেরা বুদ্ধ বাবুর কথা শুনবেন না। তিনি বিমান বসুর কথায় চলবেন। এইভাবেই বুদ্ধ দেবের ডানা ছাঁটাই করা শুরু হলো। পৌর নির্বাচনের পর বুদ্ধ দেবের বিদায় ঘণ্টা বাজবেই।

সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক সদস্য সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। দেখা যাক কি হয়।

সংবাদপত্রে দেখা গেল ফুরফুরায় ট্রেন উদ্বোধনের বিজ্ঞাপনে মমতা ব্যানার্জি মুসলমানী কায়দায় মাথায় ফেট্টি বেঁধেছেন! ফুরফুরায় মুসলমানী ধর্ম-গুরুদের দিয়ে ভবিষ্যত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতার নাম ঘোষিত করানো হয়েছে।

মমতা-মুসলিম ভক্ত, মমতা মতুয়া প্রধানা, মমতা খৃস্ট ধর্মী—আহা কি চমৎকার। এরই নাম ভোট ভিক্ষা!

এদিকে সিপিএম মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার মতে সাদা ধোপদুরস্ত পোশাকের নেতাকে মুসলমানরা গ্রহণ করবেন না। ইঙ্গিত মহঃ সেলিম। রেজ্জাক মোল্লাও মুসলিম কার্ড খেলছেন। ধন্য ভোট ভিক্ষা।

এদিকের সংবাদ কংগ্রেস-নেতা সুব্রত মুখার্জি মেয়র হবার জন্য প্রস্তুত, বর্তমান সিপিএম মেয়র বিকাশবাবু নিজের পেশায় ফিরে যেতে অগ্রসরমান।

> **"এরাজ্যের বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলেছে। তিন দশক রাজত্ব করেও সিপিএম সরকার এই সমস্যার সুরাহা করতে পারেনি। এই অপদার্থ সরকারের বিসর্জনের বাজনা শোনা যাচ্ছে। আবার বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন নিরুপম সেন! নিরুপম সেন তো ভস্মলোচন। যেদিকে চোখ দেন সেটা ভস্মে পরিণত হয়।"**

অন্য রকম

পিপীলিকার কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সত্যি মশাই। গোয়ার পিঁপড়েগুলো গোঁয়ারের মতো যা শুরু করেছে তা আর কহতব্য নয়। গোয়ার সী-বিচে এতদিন অজস্র মাতালের দেখা মিলতো; যাদের প্রায় সকলকেই দেখতে হোমো সেপিয়েন্সের (মনুষ্য পদবাচ্য জীবটির বিজ্ঞানসম্মত নাম) মতো। কিন্তু সাদা পিঁপড়েরা যে মাতাল হবার আয়োজন করছে তা একমাত্র সুকুমার রায় ছাড়া ভূ-ভারতে আর কখনও কেউ ভেবেছেন? ভাবছেন বুঝি ইয়ার্কি! মোটেও নয়। একবারটি পানাজি গিয়ে দেখেই আসুন না। তবেই তো রগড়টা মালুম হবে! সেখানকার পুলিশী গুদাম-ঘর থেকে নাকি ২৪ কেজি চরস উধাও। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার এমন অব্যর্থ নিদর্শন একমাত্র এদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর নয়। ঘটনা হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া প্রায় ২৮০ কেজি চরস মজুত ছিল পানাজির পুলিশ গো-ডাউনে। কিছুদিন আগে পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক লক্ষ্য করেন প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় থাকা ২৪ কেজি চরসের বস্তা চেটে-পুটে সাফ করে দিয়েছে সাদা পিঁপড়ের দল। যে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কয়েকশো উইপোকাও।

তবে এইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সৌজন্যে পুলিশ দফতরের বেশ বড়সড় ধরনের দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন পুলিশ ইনস্পেক্টর আশীষ শ্রীরোদকার ও তাঁর পাঁচ সহযোগী। এঁদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলে ড্রাগ-পাচার করার অভিযোগ বহুদিনের। বিশেষ করে ড্রাগ মাফিয়া ইয়ানিভ বেনিমের সঙ্গে শ্রীরোদকারের সু-সম্পর্কের কথা সুবিদিত।

গোয়ার পুলিশমন্ত্রী রবি নায়েক মেনে নিয়েছেন চরসের ব্যাগে 'সাদা পিঁপড়ের আক্রমণে'র দায়িত্ব সরকার কোনওভাবেই এড়াতে পারে না। সাংবাদিকদের সামনে গত ১৪ এপ্রিল তিনি এও বলেছেন, 'যদি সাদা পিঁপড়েরা সত্যিই ড্রাগ-ধবংস করে থাকে তবে তা অবশ্যই সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে। এমনকী কি পরিমাণ ড্রাগ ধবংস হয়েছে তার খতিয়ানও দেওয়া থাকবে সরকারি নথিতে। একাজে সরকারের কোনও আলস্য আপনারা দেখতে পাবেন না।'

আসলে ড্রাগ-পাচারে পুলিশের একাংশের জড়িত থাকার কথা গোয়াতে এখন 'ওপেন সিক্রেট'। কিন্তু সাদা পিঁপড়ের দল নিজেরা মাদকাসক্ত হয়ে সেইসব পুলিশদের এমন গাড্ডায় ফেলেছে যে বিগত কয়েক বছরে সিবিআই কিংবা অ্যান্টি নারকোটিক্স সেলও তাদের এতটা বিপদের সম্মুখীন করাতে পারেনি। তবে খুব বড় ধরনের কিছু পুলিশ- ড্রাগপাচারকারী আঁতাতের ষড়যন্ত্র না ঘটলে সাদা পিঁপড়ের চরস খাওয়ার ঘটনা সর্বাংশে সত্যি। এবং অবশ্যই এটা তাদের খাদ্য-তালিকায় নবতম সংযোজন। মাদক গলাধঃকরণ করে সেই পিঁপড়েরা কতটা সুস্থ থাকে, তার দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে থাকবেন জীব-বিজ্ঞানীরা। আর রাজনীতিকরা কৌতুক-দৃষ্টিতে দেখবেন যে পিঁপড়েগুলোর অস্তিত্ব টেকাতে কতটা উৎসাহী পানাজীর পুলিশ দপ্তর। যাই হোক এই দৃশ্য দেখলে কি বলতেন সুকুমার রায়?

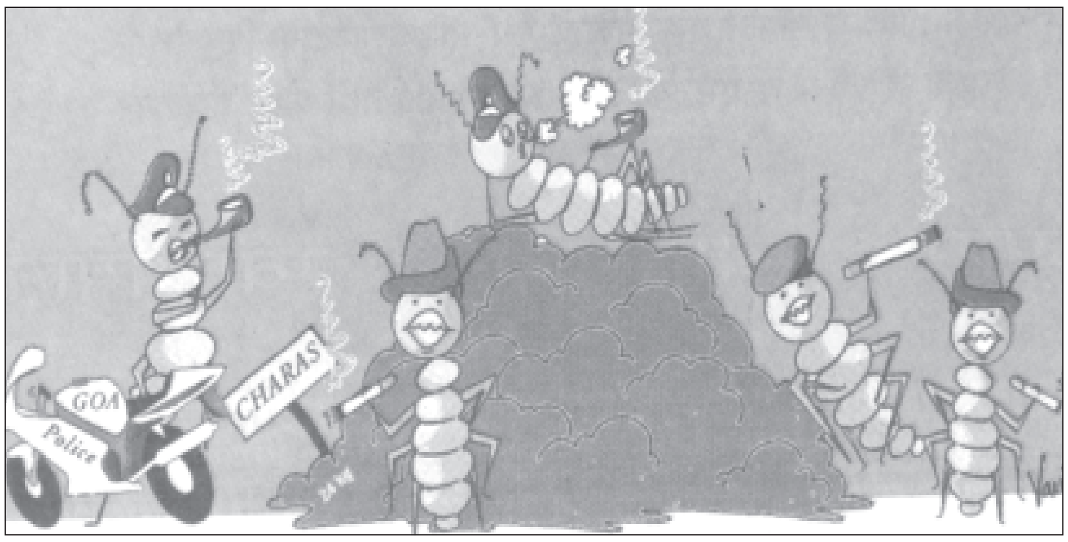

জোটেই ভরসা

কল্যাণী পুরসভা হাতছাড়া হচ্ছে বামেদের

রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 'নির্মল শহর'-এর পুরস্কার নিচ্ছেন কল্যাণীর পুর-চেয়ারম্যান।

ধীরেন দেবনাথ।। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মানসকন্যা কল্যাণী নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি পরিকল্পিত মহকুমা শহর। প্রথমে এটি ছিল 'নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি'-র প্রশাসনের অধীন। পরবর্তীকালে এটি রূপান্তরিত হয় পুরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটিতে। পুরসভার প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৯৫ সালে। ক্ষমতাসীন হয় বামফ্রন্ট।

সেই শুরু এবং আজও ক্ষমতায় রয়েছে তারা। দীর্ঘ ১৫ বছরে কল্যাণীর উন্নতি ও অগ্রগতি কম হয়নি। আবার অনেক কিছু হয়ওনি। একদা কল্যাণীতে ছিল ১৫০টির উপরে শিল্প-কারখানা। তা বন্ধ হতে হতে এখন ১০-এর মধ্যে এসে ঠেকেছে। স্বভাবতই বেকার হয়েছে আশপাশের হাজার হাজার শ্রমিক। অর্ধ লক্ষাধিক অধিবাসী অধ্যুষিত কল্যাণীর নাগরিকদের একটি বৈদ্যুতিক চুল্লির শ্মশানের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। নাগরিকদের বসবাসের জন্য মূলত দুটি ব্লক—'এ' ও 'বি' ব্লক। এছাড়াও রয়েছে আরও দুটি ব্লক। ওই দুটি ব্লকে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও শিল্প-কারখানা। 'এ' ব্লকে কোনও সুনির্দিষ্ট বাজার নেই। প্রধান রাস্তাগুলি ঝা চকচকে হলেও বিভিন্ন সেক্টরের উপরাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত করুণ—চলাচলের অযোগ্য। বহু প্লট এখনও ফাঁকা। স্তন্নগুবটলিং প্ল্যান্টটি আবাসিক এলাকার কাছাকাছি হওয়ায় আতঙ্ক একটা থেকেই যাচ্ছে।

এছাড়া কল্যাণীতে রোজকার চুরি-ডাকাতি, দিনে-দুপুরে ছিনতাই এবং দুর্বিষহ

লোডশেডিং নাগরিকদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাঁরা ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায়। পুলিশ-প্রশাসনকে এসব জানালে কখনও দেখছি-দেখব, কখনওবা তাদের অসহায়তার কথা ব্যক্ত করছে।

এমতাবস্থায় কল্যাণীতে ৩০ মে পুরভোট হতে চলেছে। ২০টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট এই পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড গ্রামীণ এলাকায়। সিপিএম ভোটের স্বার্থে এগুলিকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কিন্তু ওইসব ওয়ার্ডের উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো নয়। বহু রাস্তা ভাঙাচোরা, পানীয় জলের অভাব, বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি বহু এলাকায়। এজন্য এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ। পূর্বে ছিল ১৯টি ওয়ার্ড। এবার ১টি বেড়েছে। ওয়ার্ডটি পঞ্চায়েত এলাকার। বর্তমান পুরবোর্ডে বামফ্রন্টের দখলে ছিল ১৫টি ওয়ার্ড। ২টি করে কংগ্রেস ও তৃণমূলের। চেয়ারম্যান পদটি জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় এক মাত্র নির্বাচিত জনজাতি মহিলা সদস্যা ফরোয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্মী ওঁরাও চেয়ারম্যান পদটি না পাওয়ায় প্রতিবাদে চলে যান তৃণমূলে। আবার কয়েকমাস আগে সিপিএম থেকে নির্বাচিত আর এক কাউন্সিলর উত্তরা বারুরি সিপিএম ত্যাগ করে যোগ দেন কংগ্রেসে। ফলে বামফ্রন্টের ২টি সিট কমেছে।

গত লোকসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের হাওয়ায় পুরসভার ১৪টি ওয়ার্ডে লিড পেয়েছিল বিরোধীরা। পরিবর্তনের হাওয়া এখনও রয়েছে অব্যাহত। তাই ঠিকঠাক চললে এবং সিপিএমের রিগিং, জালিয়াতি বন্ধ করা গেলে বামফ্রন্ট কল্যাণী পুরসভা হারাচ্ছেই। এ ব্যাপারে কল্যাণী শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডঃ প্রদীপ কুমার শূরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন—শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট মাত্র ৩টি সিট পাবে। সিপিএম অবশ্য শূরের বক্তব্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে—লোকসভা জাতীয় স্তরের ভোট, কিন্তু পুরভোট স্থানীয় স্তরের। কাজেই দুটোকে এক করে দেখলে চলবে না। তাছাড়া বিগত ১৫ বছরে কল্যাণীর উন্নয়ন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। সদ্য স্থাপিত মেডিক্যাল কলেজে পঠন-পাঠন এ বছরই শুরু হচ্ছে। গঙ্গার জল সরবরাহ করে জল সমস্যার সমাধান করা গেছে। তবে সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের ঘটনা হলো এই যে, কল্যাণী পুরসভা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরসভার সম্মান পেয়েছে, পেয়েছে নির্মল শহরের তকমা।

আর এই সব বিচার করে কল্যাণীর বাসিন্দারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন যেমন তেমনি এবারও থাকবেন। লিখে নিন, বামফ্রন্ট পুনরায় পুরবোর্ড দখল করবে এবং আরও বেশি ভোটে।

সিপিএমের এইসব দাবী কতটা যথার্থ তা পুরভোটের রায়েই জানা যাবে।

এককালে কল্যাণীতে বিজেপি-র ভালো সংগঠন ছিল। পুরসভায় ২ জন সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এখন আর তার সেই শক্তি নেই। অনেকে স্বার্থের টানে চলে গেছেন অন্য সংগঠনে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি ওয়ার্ডে বিজেপি-র ভালো সমর্থক আছেন। তাই তারা এবার পুরবোর্ডে খাতা খোলার ব্যাপারে আশাবাদী। বিজেপি নেতা বঙ্কিম ধরকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হলো। কর্মীদের মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

পুরনো মালদায় নির্ণায়কের ভূমিকায় বিজেপি, ইংরেজবাজারে জোটে জট

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। আগামী ৩০ মে পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার ৮১টি পুরসভার সাথে মালদা জেলার দুটি পুরসভাতেও নির্বাচন হচ্ছে।

ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। এখানে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি যৌথ ভাবে জোট করে পৌরসভা চালাচ্ছে। গত পুর নির্বাচনে বামেরা ১১টি আসন পেয়েছিল। দুটি আসন পায় বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল ৮টি আসন এবং কংগ্রেসের দখলে ছিল ৪টি আসন। গত পুরভোটে সিপিআই এম একাই পেয়েছিল ৯টি আসন আর এস পি ও সিপিআই একটি করে আসন পায়। ইংরেজবাজার পুরসভার গতবারের নির্বাচিত তৃণমূল কাউন্সিলাররা এবার কোন দলের প্রার্থী হবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। দু একজন বাদ দিয়ে বেশির ভাগ কাউন্সিলাররা তলে তলে কংগ্রেসের সাথে যেমন যোগাযোগ রাখছে তেমনি তৃণমূলের সাথেও যোগাযোগ রাখছে। কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে এবারে ইংরেজবাজারে জোট প্রক্রিয়া জটিল আকার ধারণ করেছে। গোদের উপর বিষফোঁড়া তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গৌতম চক্রবর্তী বনাম বাবলা সরকার-এর মধ্যেই কংগ্রেস সভাপতি আবু হাসেন খান জোট নিয়ে আলোচনা করলেও এখনও সিট বন্টন নিয়ে সহমত হয়নি। জানা গেছে দুই দলই ইংলিশবাজার পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২-১৩ টি আসন চাইবেন। ২০০৫ সালে পুর নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক অবস্থান অন্যরকম ছিল। ইংরেজবাজারের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী নিজেই তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন। তার নেতৃত্বেই তৃণমূল ইংলিশবাজার পুরসভায় ৮টি আসন পেয়েছিল। এখন কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী ইংলিশবাজারের কংগ্রেসের বিধায়ক। ১০নং ওয়ার্ড যেটির মধ্যে কৃষ্ণেন্দুর বাড়ি সেই ওয়ার্ডটি তৃণমূল দাবী করাতেই অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা কংগ্রেস। এখন আবার ইংরেজবাজার পুর-চেয়ারম্যান কংগ্রেসের কৃষ্ণেন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে দল ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন। ফলে এবারে গত বারের যে জোট ছিল তা কতটা থাকবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিজেপি এবারে একক ভাবে আসন বাড়িয়ে ৪টি করবে বলে জানিয়েছে। অম্লান ভাদুড়ী বিজেপি কাউন্সিলার। অপর দিকে বামফ্রন্ট তাদের শরিকী ঝামেলায় আসন ভাগাভাগি নিয়ে

ঝামেলায় পড়লেও কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের ঝগড়াকে কাজে লাগিয়ে তলে তলে বিক্ষুব্ধ প্রার্থীদের বাগে আনার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত ইংলিশবাজার পৌরসভা হারালেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না বলে অনেকেই মনে করছেন। তবে শেষ কথা বলবেন জনগণ।

অপর দিকে পুরাতন মালদা পৌরসভাতে এবার গত বারের ১৭টি আসন বেড়ে হয়েছে ১৮টি। বর্তমানে পুরাতন মালদা পৌরসভা বামফ্রন্টের দখলে আছে। গত নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন বাতিল হয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস ছিটকে গিয়েছিল। ফলে ১৭টি আসনের মধ্যে ১২টি পেয়ে যায় বামফ্রন্ট। একটি নির্দল। এবং ৪টি বিজেপি পেয়েছিল। পুরাতন মালদা পৌরসভা কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। এবারে সেখানে সিপিএমকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে হবে। বিজেপির শক্তি পুরাতন মালদা পুরসভাতে যথেষ্ট ভাল। গতবার ৪টি আসন পেলেও এবারে একক ভাবে আসন দ্বিগুণ করবে বলে মনে করছেন বিজেপি নেতৃত্ব এবং সেক্ষেত্রে বিজেপি পুরসভা গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন অনেকেই। এই পুর নির্বাচনে সিপিএমের দায়িত্বে রয়েছেন বিধায়ক খগেন মুর্মু। এখানেও আসন ভাগাভাগি নিয়ে চলেছে শরিক দলের সঙ্গে আলোচনা। অন্যদিকে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেও আসন ভাগাভাগি নিয়ে চলছে জোর লড়াই। গতবার কেন কংগ্রেসের প্রতীক বাতিল হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেকেই পিছনে সিপিএমের হাত দেখতে পাচ্ছে। এবার লড়াইটা গতবারের চাইতে ভিন্ন হবেই বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

সুব্রমনিয়ানের অভিযোগে বিপাকে টেলিকম মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ টেলিকম মন্ত্রী এ. রাজার বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন জনতা দলের সভাপতি এস. সুব্রমনিয়ান স্বামী। তিনি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—বিধিবহির্ভূতভাবে টু-জি স্পেকট্রাম (বর্ণালী)-এর জন্য যে 'অ্যালোকেশন' করা হয়েছিল তা বাতিল করে স্বচ্ছ নিলামের বন্দোবস্ত করতে হবে, ঠিক যেমনটি থ্রি-জি অ্যালোকেশনের ক্ষেত্রে চলছে। এর ফলে সর্বোচ্চ আর্থিক লাভ হবে বলেও তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। সুব্রমনিয়ানের অভিযোগ, মন্ত্রীর গাফিলতি প্রমাণিত হয়ে গেছে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের প্রতিবেদন এবং ক্যাগের (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) সাম্প্রতিক সমীক্ষায়। যেখানে এ রাজার 'স্পেকট্রাম অ্যালটমেন্টে'র ক্ষেত্রে বহু কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি নজরে এসেছে।

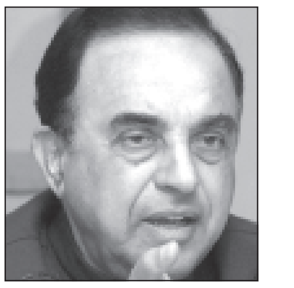
সুব্রমনিয়ান স্বামী

এ রাজা

গত ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীকে স্বামীর পাঠানো চিঠির হুবহু বয়ান হলো এইরকম—"আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, জনগণের স্বার্থে ও ন্যায়-বিচারকে সম্মান জানানোর লক্ষ্যে আমার মনে হচ্ছে সোয়ান টেলিকমের টু-জি স্পেকট্রাম অ্যালটমেন্ট একেবারেই বাতিল করে দেওয়া উচিত। শুধু সোয়ান টেলিকমই নয়, সেইসাথে ইউনিটেক ও অন্যান্য সংস্থা যারা ভাঁওতা মেরে 'ফার্স্ট কাম ফাস্ট সার্ভ' ভিত্তিতে অন্যায়ভাবে সেই অ্যালটমেন্টের ভাগীদার হয়েছিল, তাদেরটাও বাতিল করতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ২০০১-এর নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী-ই এই অ্যালটমেন্ট করা হয়েছিল।"

প্রসঙ্গত, এই বিষয়টাকে নিয়ে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট অবধি দৌড়েছেন স্বামী। ইতিপূর্বে স্বামীর করা মামলার ভিত্তিতে দিল্লী হাইকোর্টও ২০০৮-এর ১০ জানুয়ারি টু-জি অ্যালটমেন্টকে 'বিধিবহির্ভূত ও অনৈতিক উপায়ে সাধিত হওয়া' বলে আখ্যায়িত করেছিল। তবে মজার কথা হলো, এস সুব্রমনিয়ান স্বামীর অভিযোগটা এমন একটা দিনে এল যখন একদিকে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও লিখছেন, অন্যদিকে দিল্লী হাইকোর্টে অভিযোগ দায়ের করছেন যাতে আদালত প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর টেলিকম মন্ত্রী এ রাজাকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন। যদিও মামলাটির পরবর্তী রায়দান আগামী ১৮ মে পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। আর এই মামলায় 'ফার্স্ট পার্টি' হলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্বয়ং আর 'দ্বিতীয় পার্টি' হলেন টেলিকম মন্ত্রী। এই স্পেকট্রাম দুর্নীতিটাকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক লড়াই-এর সঙ্গে সঙ্গে আইনী যুদ্ধেও যে প্রতিপক্ষের উপর চাপ বাড়াতে চাইছেন স্বামী তা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ১৯৯৬ সালে প্রাক্তন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সতীশ শর্মার পেট্রল পাম্প' সংক্রান্ত বিধিবহির্ভূত অ্যালটমেন্টের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে তা বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল এবং নতুন করে সেই সংক্রান্ত নিলাম ডেকেছিল—এই ইতিহাসের ওপর ভরসা করেই যাবতীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন সুব্রমনিয়ান। প্রসঙ্গত, নরসিমা রাও আমলের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী সতীশ শর্মা বেআইনীভাবে নামমাত্র মূল্যে পাঁচশোরও বেশি পেট্রল পাম্পকে ব্যবসা চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন যাদের সবকটার ব্যবসা-গোটাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। পরবর্তীকালে স্বচ্ছ নিলামের পর ১৫০ কোটি টাকা কোষাগারে ভরতে পেরেছিল ভারত সরকার। স্বামীর মারাত্মক অভিযোগ—'সোয়ান এবং ইউনিটেক ২০০৮-এ নিলামে যে দর হেঁকেছিল তার থেকে প্রভূত পরিমাণে কম টাকা দেওয়া হয়েছিল টু-জি স্পেকট্রাম কেনার ক্ষেত্রে।' তবুও তারা যে টাকাটা দিয়েছিল তা-ও নেহাৎ কম নয়। ভারতীয় মুদ্রায় তার পরিমাণ ১৬০০ কোটি টাকা। প্রকৃত দামটা তবে কত? সত্যি স্বচ্ছ নিলাম না হলে তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে এ. রাজা না সরলে টু-জি স্পেকট্রামের নিলাম সুদূর পরাহত।

রাজনৈতিক উদাসীনতায় সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এযাবৎ শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যবজায় রাখা সামাজিক পরিকাঠামো এবং অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কারণে কেরলকে ভগবানের আপন দেশ বলা হোত। কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ সরকার এবং তস্য অপদার্থ বিরোধী কংগ্রেসের সৌজন্যে তা এখন জঙ্গিদের নিশ্চিন্ত তো বটেই, সেইসঙ্গে গোপন লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। হরেক কিসিমের জঙ্গির সন্ধান মিলবে এখানে। তারমধ্যে যেমন মাওবাদীরা রয়েছে, তেমনি রয়েছে জেহাদীরা, উপরি পাওনা হিসেবে হাজির চরমপন্থী কিছু দলিত সংগঠন।

এদের লক্ষ্য আলাদা হলেও, মনুষ্য হত্যার কক্ষ থেকে বিচ্যুত হওয়ার নামগন্ধ করছে না এরা কেউই। সেইসাথে সরকারি তরফের অপদার্থতা এদের ক্রিয়া-কলাপে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে।

কেরল উচ্চ-ন্যায়ালয় গত ১৫ এপ্রিল একটি অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করে বলেছে, সরকার ইসলামিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপে ব্যবসায়িক সহযোগিতার পরিকল্পনা করেছিল, তা এই মুহূর্তে আদালত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছে না। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কে সুব্রামনিয়ন স্বামী ও এর্নাকুলাম গ্রামের বাসিন্দা দলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি বাবুর করা এক মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি জে. চিলামেশ্বর এবং বিচারপতি সি এন রামচন্দ্রন নায়ারের ডিভিশন বেঞ্চ ওই রায় দেন। সরকারি পরিকল্পনা অনুসারে, শিল্পের উন্নতির যান হিসেবে এই পরিকল্পনা কার্যকর হবে। পরিকল্পনাটা হলো, কেরল স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশান-এর ১১ শতাংশ শেয়ার ছিল নন-ব্যাঙ্কিং অর্থনৈতিক সংস্থা আল-বারাক ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেসের। এই সংস্থাটি পরিচালিত হচ্ছে ইসলামিক শরিয়ত ফাইনান্সিয়াল নীতির মধ্য দিয়ে। মূলত মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী ভারতীয়রা ওই কেরল স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বাকি ৮৯ শতাংশ শেয়ার কিনেছেন। যাদের অধিকাংশের সঙ্গেই পেট্রো-ডলার গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সবচেয়ে লজ্জাকর কথা, ভি এস অচ্যুতানন্দনের সরকার সব জেনেশুনেও মুখে কুলুপ এঁটে ছিল।

জেহাদি ইসলামকে প্রশ্রয় দেবার একটা গুরুতর অভিযোগ যখন কেরল সরকারের বিরুদ্ধে উঠছে, ঠিক তখনই সিবিআই একটি গোপন প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, অতি সম্প্রতি অন্তত ডজনখানেক অস্ত্র-শস্ত্রধারী মাওবাদী

কর্ণাটক থেকে কেরলে প্রবেশ করেছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই আন্তঃ রাজ্য সীমানার গুলির লড়াই-এ এক মাওবাদীর মৃত্যু হয়। তাদের মহিলা অ্যাকশন স্কোয়াডের এক সদস্যা গুলিবিদ্ধ হবার পর পালিয়ে যান কেরলে। তারই পেছনে পেছনে এমন অনেকে ঢুকে পড়েছে বলে সিবিআই তাদের প্রতিবেদনে সতর্ক করেছে যাদের নামে ইতিমধ্যেই বহু ক্রিমিনাল কেসের মামলা ঝুলছে এবং পীপুলস্ ওয়্যার গ্রুপের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

কেরল পুলিশের একটি সূত্র কিন্তু এই গোপন রিপোর্টের কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। যদিও তাঁরা বলছেন, এনিয়ে কেরল-পুলিশের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

অসমর্থিত সূত্রের খবর হলো, কর্ণাটক পুলিশের একটি টীম ইতিমধ্যেই কেরলে পৌঁছে খানা-তল্লাসী শুরু করেছেন বিশেষ করে দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলে। আই বি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, কেরলের কয়েকটি কট্টর বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে এই মাওবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এই ধরনের সন্ত্রাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এমন এক অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা-আধিকারিকের বক্তব্য—"ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী, মাওবাদী এবং চরমপন্থী দলিতশ্রেণী দেখেছে যে কেরল তাদের কাছে স্বর্গরাজ্য। কারণ তাদের নিরাপত্তা কেরল পুলিশের সৌজন্যে একবারের জন্যও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। উপরন্তু নির্বিঘ্নে বড় ধরনের 'অপারেশন' চালানোর ছক এখানে বসে নিশ্চিন্তেই করা গেছে। যতদূর দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে স্থানীয় মানুষ এবং কয়েকজন রাজনীতিবিদের সহানুভূতি আদায় করতে ওই সন্ত্রাসবাদীরা সফল হয়েছে।" প্রসঙ্গত, কেরলে সন্ত্রাসবাদীদের উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছিল ২০০৬-এ কোঝিকোড়ে দ্বৈত বিস্ফোরণের পর থেকেই। ২০০৮-এ কেরলবাসীর ওপর নৃশংস হামলার নেতৃত্বে ছিল লস্কর এ তৈবার কম্যান্ডার খাদিয়ান্তেভিদ নাজের। এই হামলার জন্য ইসলামিক ছাত্র সংগঠন সিমি তার আগের বছর অর্থাৎ ২০০৭-এ ভাগামন বলে একটা জায়গায় প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল এবং কেরল পুলিশের নাকের ডগাতেই তা সম্পন্ন হয়েছিল।

তাহাউর রানার সঙ্গে কেরল-বেসড জঙ্গিগোষ্ঠীর আঁতাতের কথা প্রশাসনিক মহলের সকলেরই জানা।

একটা সময় ছিল যখন তামিল টাইগাররাও আস্তানা গেড়েছিল কেরলের জঙ্গলে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের দেওয়া একটা ভয়াবহ তথ্যানুযায়ী, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ঝাড়খন্ডের মাওবাদীরা কেরলে এসে নির্মাণ কার্যে এবং গ্রানাইট ভাঙ্গার কাজে যাযাবর শ্রমিকের মতো অংশ নিচ্ছে পরিচয় গোপন করে এবং পরে সুযোগ বুঝে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ সহ বিভিন্ন মাও-অ্যাকশন স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছে।

গল্প

বিকল্প

অরুণ কুমার ঘোড়ই

পিঠের যন্ত্রটাকে একটু সাবধানে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে গোপাল। ভীড় আর ভীড়। উজ্জ্বল পোষাকের যুবক-যুবতী শিশু-কিশোররা হৈ-হৈ করতে করতে এগিয়ে চলেছে—কেউ স্টেশন-গেটের দিকে, কেউ ট্রেনের গেটের দিকে। পরস্পর বিপরীত জনস্রোতের মাঝখানে কিছুটা সময় থমকে যেতেই গোপালের কানে এসে বাজে মৃদু মোলায়েম সানাইয়ের সুর।

আজ মহাসপ্তমী।

গোপাল পা চালায়...গেটের দিকে নয়—লম্বালম্বি প্লাটফরম বরাবর...একদম বাইরের দিকে দোকান পশার কমতে কমতে ওদিকটা আর একদম নেই। লোকজন খুব একটা কেউ ওদিকে আসে না। রেলের সিগন্যালিং

সাহিত্যের পাতা

ঘর...পাশে একটা ভাঙা টিউব-ওয়েল...কিছু দূরে ডাঁই করা রেল লাইনের বাতিল লোহা-লক্কড়। আর তার পাশে আগাছা-লতাপাতার জঙ্গলে নাকছাবির মতো অসংখ্য ফুলের ওপর প্রজাপতিদের ব্যস্ত ওড়াওড়ি। সকালের নরম আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে চারপাশ। বাতাসে ঈষৎ হিমের ছোঁয়া। দূরে সবুজ ধানগাছগুলো হাওয়ার সুড়সুড়িতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে। গোপাল দূরের দিকে তাকিয়ে সেই আল-রাস্তাটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগলো যেটা ধরে আধঘন্টা এগুলে তার বাড়ি।

এরই মধ্যে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল তার গন্তব্যে।

গোপালের খেয়াল হলো—প্ল্যাটফরমটা যেন একটু একটু ভেজা। তার মানে গতকাল রাতে কিছুটা বৃষ্টি হয়েছে। হতেই পারে...শরতের মেঘ ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মতো;আর গোপাল নিজে তো ছিল শিয়ালদা স্টেশনে...ঠাওর পাবে কি করে যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে! সেখানে দিনের মতো আলো...হাসি আর আনন্দের কলরোল তোলা চলন্তিকা জীবন। অভাবের ভাব তার ধারে-কাছেই ঘেঁষে না। রোদ কিংবা বৃষ্টি তাকে প্রভাবিত করে না। মা আনন্দময়ীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ তো এই শহরের বুকে, গ্রামের কথা কি তার মনে পড়ে!

ফোঁস্ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে গোপাল বাউরীর। মনটা আজ তার ভাল নেই। এবারের পুজোয় সে কর্মহীন। তার পঞ্চাশ বছরের জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় ধরে সে ঢাক বাজিয়ে আসছে দুর্গাপুজোয়... কোথাও না কোথাও। ধুতি-হাফশার্ট পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে নেচে নেচে ঢাকে 'ড্যাম কুড় কুড়' বোল। এবারেও বায়না ছিল দূরের গ্রামে। কিন্তু আচমকা বন্যা হয়ে যাওয়ায় সে পুজো বাতিল হয়েছে। অগত্যা ঢাকটাকে কাঁধে নিয়ে ট্রেনে চড়ে পাড়ি দিয়েছিল শিয়ালদা স্টেশনে। তার মতো অনেকেই গিয়েছিল। ডাকও পেয়ে গেছে কেউ কেউ। মুষ্টিমেয় যারা পেল না গোপাল পড়ে গেছে সেই হতভাগ্যদের দলে। অগত্যা দু'রাত স্টেশনে কাটিয়ে ফিরতি-ট্রেনে ঘরের দিকে। শুধু একটা খিঁচ-খিঁচানি বুকের মধ্যে গেঁথে রইল-ঘরে গেলেই তো মেয়েটা তাকে ছেঁকে ধরবে—বাপ্, আমার জামা? কি জবাব দেবে তাকে! আলগোছে গোপালের হাতটা চলে যায় নিজের জামার পকেটে। আছে...পাঁচ টাকার কয়েনটা। ট্রেনের টিকিট কাটলে অবশ্য থাকতো না। গত রাতের পাঁউরুটি খরচের পর এইটুকুই তাঁর বাঁচোয়া।

আবার সানাই-এর সুর এসে কানে বাজতেই চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় গোপালের। রেল গেটের বাইরের পুজো-মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে এ সুর। একবার যাবে ওদিকে? কেমন হয়েছে মায়ের মুখখানা—

—নাহ্, থাক্! পরে না হয় একদিন—

গোপাল পা বাড়ায় প্লাটফরমের শেষ প্রান্তের দিকে। ওখান থেকে নেমে যাবে সে মাটির রাস্তায়। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো—পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে প্ল্যাটফরমের একধারে হৈ-হুল্লোড় করছে। রেলের সিগন্যালিং ঘরের

দেওয়ালের পাশে কঞ্চি দিয়ে ছেঁড়া পলিথিন টাঙিয়ে বানিয়ে নিয়েছে ঝুপড়ি ঘর। তার মধ্যে যত রাজ্যের রঙীন কাগজ, ভাঙা প্লাস্টিকের খেলনা...নারকেলের শক্ত খোলা...জরি কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি। ছেলেমেয়েগুলোর প্রত্যেকের বয়স ছয় থেকে আট বছরের মধ্যে হবে। লাল ঘাঘরা-চেলি পরা একটি ফুটফুটে মেয়ে বসেছে একটি টুলের ওপর...তার পায়ে আলতা...মাথায় ফিতে...কানের লতিতে ছোট রিং...হাতে তার টিভি-এ্যান্টেনার একটি বাতিল স্টিক্। তার পায়ের কাছে কলাপাতায় জড়ো করা জংলিফুল। সকলে তাকে নিয়ে মজা করছে। কেউ তার পায়ে ফুল দিচ্ছে...কেউ তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে...কেউ আবার হামাগুড়ি দিয়ে তার পিছনে গিয়ে বলে উঠছে—হালুম! মেয়েটি ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে সেই স্টিকটিকে বর্শার আদলে কখনো তাক করছে এর দিকে কখনো ওর দিকে।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে গোপাল দেখছিল এইসব। খুব ভাল লাগছিল তার। একসময় ছেঁড়া পলিথিন ফুঁড়ে এক ফালি সোনা রোদ সেই মেয়েটির মুখের উপর পড়তেই চক্চক্ করে উঠলো তার কপালের টিপ—যেন তৃতীয় নয়নের আগুন। কি এক মুগ্ধতায় পেয়ে বসলো গোপালকে। তার মনের ফ্রেম থেকে মা দুগ্গার ছবিখানি যেন ঠিকরে পড়ে গেছে এই প্লাটফরমে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে নিজেরই অজান্তে পিঠের ঢাকটাকে ঘুরিয়ে আনলো সামনের দিকে। তারপর তার ঢাকনা কাপড় সরিয়ে তাতে জোড়া কাঠির ঘা বসালো। বোল উঠলো—ড্যাম্ কুড় কুড়...ট্যাঁই কুড় কুড়...! সেই সময় ওদেরই কেউ একজন দু'হাতের মুঠিতে শাঁখের আওয়াজ তুললো।

ঢাকের শব্দ শুনে অন্যান্যরা দৌড়ে এলো গোপালের দিকে, কিন্তু সে মেয়েটি এলো না। বরং মুখে কপট গাম্ভীর্য্য এনে বড় বড় চোখ করে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাতের স্টিকটিকে বাগিয়ে ধরে নিশ্চল হয়ে রইল টুলের ওপর।

এক মিনিট...দু'মিনিট...তিন মিনিট...

গোপাল ঢাক বাজনা থামিয়ে ঢাকটাকে পাশে রেখে একটু দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করলো। পকেটের কয়েনটাকে ছুঁড়ে দিল মেয়েটির পায়ের দিকে। বিড় বিড় করে বললো—মা-মাগো!

তারপরেই লজ্জায় পড়ে গেল সে। দেখলো—বেশ কয়েকজন লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে তার পিছনে। তাড়াতাড়ি ঢাকটাকে কাঁধে নিয়ে প্লাটফরমের শেষ প্রান্তের ঢালু দিয়ে মাটিতে নেমে এসে পা চালিয়ে দেয় সামনের দিকে।

কিন্তু মেয়ের জামার সমস্যা? ঘরে গেলেই তো সে ঝাঁপিয়ে আসবে!

মুহূর্তের জন্য মনটা দমে যায় গোপালের। হাতের আঙুলগুলো ফিরে আসে জামার শূন্য পকেট নাড়িয়ে। এক মুঠো হা-হা বাতাস যেন বুকের গভীর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আটকে যায় চোখের দোড়গড়ায়। একটা চিরায়ত অপরাধ বোধ আবার নতুন করে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে। কি বলবে সে তার মেয়েটাকে যে সারাবছর ছেঁড়া ন্যাকড়ায় দিন কাটিয়ে পুজোর সময় একটা নতুন জামার গন্ধের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে!

'যা দেবী সর্বভূতেষু...' কাছে মাইক বাজছে।

গোপালের পা শ্লথ হয়ে আসে। সে মনের ভেতর মা দুগ্গার মুখের ছবিটা আঁকার চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক যেন পারে না। আসলে সে তো এবছর এখনো কোনও মণ্ডপে ওঠেনি কিনা। বরং একটু আগে প্লাটফরমের সেই মেয়েটির ঝিলিক দেওয়া মুখ এখনো তার চোখের ফ্রেমে থির হয়ে আছে। টিভি-এ্যান্টেনার ত্রিশূলে কাল্পনিক দানবকে হত্যা করার উদ্যোগ এখনো সমান চলমান। এবং কি আশ্চর্য্য—তারই পাশে তার নিজের মেয়ের মলিন মুখটাও ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।

গোপাল আকুল হয়ে ভাবতে থাকে—জগতের দুঃখু-অভাবগুলোকে এমনি করে ত্রিশূল দিয়ে মেরে ফেলার মতো তীব্র কটাক্ষ হেনে কেউ যদি এসে হাজির হোত...!

নমস্তস্যৈ...নমস্তস্যৈ...নমস্তস্যৈ...নমঃ...নমঃ...!

পায়ে পায়ে ধান জমির কাছে এসে দাঁড়ায় গোপাল। সরু আল-রাস্তাটা ধরে এবার তাকে হাঁটতে হবে ঘরের দিকে। ঘরের দুয়ারে পৌঁছে দেখতে পাবে মেয়েকে...গোপাল এবার মনে মনে সাজিয়ে নেয়—কিছু বলে ওঠার আগেই মেয়েটাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরবে...তার মুখে চুমু খাবে...আচ্ছা করে আদর করে দেবে—তারপর...তারপর. .তারপর...!

কিন্তু গোপাল আর খুঁজে পায় না রাস্তাটাকে। চোখের ঝাপসা দৃষ্টির মাঝে হারিয়ে যায় এতদিনের চেনা পথটুকু! একসময় ক্লান্ত হয়ে সে মাটিতেই বসে পড়ে...পিঠের ঢাকটাকে সামনে এনে তার উপর মুখ ডুবিয়ে একসময় সে ফুঁপিয়ে ওঠে—মা, মাগো!

নাটক

কর্মফল

কাহিনী সূত্র—বনফুল

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

চরিত্র লিপি

হারাধন ভরদ্বাজ—ডাক্তার, বয়স ৫০ৎ

সুরেশ—যুবক,

শীতল—যুবক, ছাত্র।

স্ত্রী—বয়স ৪৫ৎ

দৃশ্য—১

(পর্দা উঠলে দেখা যায় একটি ঘর। সাধারণ আসবাবপত্র, ফাঁকা ঘরে সুরেশ প্রবেশ করে।)

সুরেশ ঃ ডাক্তারবাবু আছেন নাকি? ডাক্তারবাবু।

(এদিকে ওদিক তাকিয়ে)

(ডাক্তার হারাধন ভরদ্বাজ প্রবেশ করেন।)

হা ঃ কি ব্যাপার ডাকি সুরেশ, এতো সহাল সহাল আমার লগে কি দরকার? ব্যামো ধরসে নাকি?

সুরেশ ঃ ধরেনি, কিন্তু ধরেছিলো।

হা ঃ মানেডা কি হইল! (অবাক হয়ে)

সু ঃ ডাক্তারবাবু আমি অফিস কামাই করে দীঘা বেড়াতে গেছিলাম। এখন আপনি যদি একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেন যে, এতদিন আমি অসুস্থ ছিলাম।

হা ঃ হাঃ হাঃ ও এই ব্যাপার। এতো বেব্যাক দিতাছি। তবে কিনা...

সু ঃ নানা ডাক্তারবাবু ফিসের কথা ভাববেন না। আপনি যা চাইবেন দেব।

হা ঃ তবে একটু বস।

(হারাধন ডাক্তার প্যাডে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন।)

এই নাও।

সু ঃ (হাত বাড়িয়ে) এই আপনার দক্ষিণাটা ডাক্তারবাবু। খুব উপকার হোল ডাক্তারবাবু।

হা ঃ এটা আর এমন কি কাজ। দক্ষিণাটা ঠিক ঠাক পেলে...হা হা।

সু ঃ আসছি ডাক্তারবাবু।

(সুরেশ বেরিয়ে যায়। হারাধনের স্ত্রী প্রবেশ করেন। হাতে চায়ের কাপ।)

স্ত্রী ঃ কাজটা কি তুমি ঠিক করছো? (চায়ের কাপ রাখতে রাখতে)

হা ঃ কোন কাজডা?

স্ত্রী ঃ ওই যে যাকে-তাকে না জেনেশুনে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছো।

হা ঃ আরে বাবা অতো ভাবলে কি

রম্যরচনা

শব্দদূষণ না শব্দভূষণ

দীনেশ চন্দ্র সিংহ

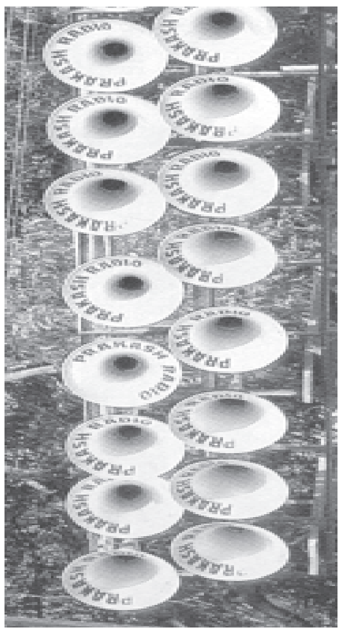

শব্দ দূষণ শব্দদূষণ বলে চারদিকে মহাশোরগোল পড়েছে ;এবং তাতে যে মহাশব্দের সৃষ্টি হচ্ছে তা দুই মাতালের 'তুই চুপ কর' কাহিনীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মহাশব্দ করেই তো ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তাই বলা হয় শব্দব্রহ্ম, অর্থাৎ শব্দরূপ ব্রহ্ম বা শব্দাত্মক ব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম বলতে আদি ধর্মগ্রন্থ বেদকেও নাকি বোঝায়। বেদের মূল হলো 'প্রণব'। প্রণব সকল মন্ত্রের আদ্যবীজ। ওঁ বা ওম্ ধ্বনিতেই তার প্রকাশ। ওঁকারই মহাশব্দ এবং স্বয়ং ভগবান। আর ভারতভূমিতেই এই ওঁকার বা ওঙ্কার ধ্বনির সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে তার রূপদান করে বলেছিলেন ঃ—

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগমনবার্তা যেমন ঘোষিত হয়েছিল মহা শব্দ মারফত, তেমনি বিশ্বের-বুকে মানুষের আগমনও সূচিত হয় ওই শব্দ মারফতেই। আজকাল তো শব্দের নিন্দা লোকের মুখে মুখে। অথচ এই শব্দ মুখে নিয়েই মনুষ্যের আবির্ভাব ধরিত্রীর বুকে। মানবশিশু মাতৃজঠর চ্যুত হয়েই শব্দ করে। তার সেই ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি—তা আদি ধ্বনি ওঙ্কারের সংক্ষিপ্ত রূপ কিনা শব্দবিদরাই বলতে পারেন।

তবে বহু সন্তানের জনক রবীন্দ্রনাথ মানব শিশুদের মুখে ওঁয়া ওঁয়া রূপ চিল-চিৎকার শুনে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—

এতটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়!

যাহোক, এসব তো পুরনো কথা। কিন্তু বর্তমানে শব্দদূষণ নিয়ে যেমন বিতর্ক চলছে, তার সূত্রপাত বৃটিশ শাসন থেকেই। এদেশে তারা কামান-বন্দুকের শব্দ তুলেই রাজত্ব কায়েম করে। তারপর যখন শিল্প বিপ্লব ইউরোপ ছাপিয়ে ভারতের বুকে আছড়ে পড়ে, সে সঙ্গে কর্ণ-পীড়াদায়ক, শব্দ-শত্রু ও সাগর পাড়ি দিয়ে দেশের বুকে গেঁড়ে বসে। এদেশে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হলে যে নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে শব্দ দৈত্যের হুঙ্কার শোনা গেল, কোনও এক অজ্ঞাত কবি তার নিবন্ধে বর্ণনা দিয়েছিলেন—

সাঁ সাঁ ধুপ ধুপ গড়গড়গড়
ঐ চলে রেলগাড়ী বহে যেন ঝড়।
আগুন জলের জোরে চলে ওর কল
ভেঙ্গে চুরে আছে যেন অসুরের দল।
চোঙ্গা হতে ধোঁয়া গুলি পিছু পিছু ধায়
প্রাণ লয়ে বনপাখী সভয়ে পলায়।
ধন্য হে ইংরাজ রাজ কৌশল মহৎ
ছয় দিনে চলে যাই ছ'মাসের পথ।

কু ঝিকঝিক রেলগাড়ি যদি স্থলভূমিকে শব্দদূষিত করে থাকে, তাহলে জলভাগকে দূষিত করেছে কয়লার ইঞ্জিন চালিত বিশাল বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ। জলস্থলের পর অন্তরীক্ষও বাদ পড়েনি যান্ত্রিক শব্দদূষণ থেকে। অজস্র ব্যোমযান বা এরোপ্লেনের দিনরাত কর্ণবিদারী মহাশব্দে আকাশমণ্ডল দীর্ণবিদীর্ণ হচ্ছে। আর জনবসতি এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে সশব্দে ধাবমান বাস, লরি, মোটর, ট্যাক্সি, অটো রিক্সা ইত্যাদির সমবেত শব্দ ঝঙ্কার।

আর হরেক শ্রেণীর কলকারখানার ভেতরের লোহালক্কড়ের ঝনঝনানি শব্দে শুধু যে অভ্যন্তরস্থ শ্রমিকদেরই কানে তালা লাগে তাই নয়, কারখানার চারপাশের বাসিন্দাদেরও নানাবিধ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও স্নায়বিক ব্যাধির সহজ শিকার হতে হচ্ছে।

সুতরাং শব্দদূষণ নিয়ে যতই উদ্বেগ প্রকাশ হোক না, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ভোগবাদী জীবনযাত্রার অশোভন প্রতিযোগিতার কাছে মানুষের শুভ চিন্তা চেতনাই হার মেনে নিচ্ছে। শব্দ-দানবের কাছে জান্তে অজান্তে নিজেদের সঁপে দিচ্ছে। শব্দের দৌরাত্ম্যে দেবদেবী-আল্লা-খোদাও যেন বধির হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। তাদের কাছে প্রার্থনার বাণী পৌঁছে দিতেও যন্ত্রের সাহায্য নিতে হচ্ছে। চড়া সুরে মাইকে না ডাকলে সে আহ্বান নাকি ঈশ্বর-আল্লার দরবারে পৌঁছায় না। এমন কানে কালা ঈশ্বর-আল্লাকে যে ই এন টি স্পেশালিস্ট দেখানো দরকার, সে কথা বলার মুরোদ নেই কারও।

নদীর বুকে দাঁড় টানা পাল খাটানো নৌকার স্থান দখল করেছে বড় বড় জাহাজ লঞ্চ । তাদের বিকট শব্দে চাপা পড়েছে মাঝির কণ্ঠের ভাটিয়ালী গান। চাষের জমিতে
লাঙ্গল বলদকে হটিয়ে হট্ হট্ চলছে কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর। ফুরিয়েছে চাষীর মুখের হই-হির-র-র শব্দে গরু তাড়ানো বুলি ও কর্মক্লান্তি ভোলার সারি গানের সুর।

এই শব্দ-শয়তানির পাল্লায় পড়েছে মানুষের পারিবারিক জীবন। যে দুদ্দাম শব্দের সঙ্গে টিভির পর্দায় ইতর নাচ অশ্লীল গান পরিবেশিত হচ্ছে, তার হাত থেকে ভদ্র সমাজের রেহাই নেই। তার পাল্লায় পড়ে—

"এখন যন্ত্রযুগের মান বেড়েছে
মন্ত্রযুগ গেছে অধঃপাতে।
দেখি অটোমেটিক কলের ঢেঁকি
নিত্য ভানে ধান,
গিন্নীরা সব পেয়ে আসান,
টিভির গান শোনে কান পেতে।"

তার ফলে বাংলার ঘরে মহিলাদের পদাঘাতে যে মিষ্টিমধুর ঢেঁকির বাদ্য শোনা যেত, তাও লোপ পেয়েছে।

তবে সবার উপর টেক্কা মেরেছে বাক্য-বোমা। রাজনীতিকদের অবিরত বাক্য-বরিষণে সমগ্র পরিবেশ যেভাবে বিষাক্ত হচ্ছে, তার মতো শক্তিশালী শব্দদূষণ ক্ষমতা আর কোনও যন্ত্রোৎসারিত শব্দের নেই।

এই শব্দ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই ভাবেন মলেই বাঁচি। কিন্তু মরেও কি শান্তি আছে? শবযাত্রায় 'বল হরি হরিবোলে'র বিসদৃশ চিল্লানিতে মড়াও বোধহয় কানে আঙ্গুল দেয়!

মানুষের জীবন যেভাবে শব্দ দূষণ নয়, শব্দভূষণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে তার থেকে নিস্তারের কোনও পথ নেই। নিঃশব্দে সহ্য করাই নিয়তি

বিপুল ডারে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইতে পারতাম। কত খরচ কও তো। হেইসব সার্টিফিকেট দিলে তিনগুণ পয়সা পাওয়া যায়। যাও যাও, ও সব তুমি বুঝবানা।

স্ত্রী ঃ কি জানি বাবা, যা খুশী করো।

(স্ত্রী বেরিয়ে যায়, ডাক্তারবাবু চা খেতে থাকেন। একটু পরে শীতল ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পড়ে ঘরে প্রবেশ করে)

শীতল ঃ ডাক্তার ভরদ্বাজ কি আপনি?

হা ঃ হ্যাঁ ডাক্তার হারাধন ভরদ্বাজ।

শীতল ঃ আচ্ছা, আসলে আমাকে এই অঞ্চলে থাকেন মিঃ নবীন তালুকদার পাঠিয়েছেন।

হা ঃ ও, ও, নবীন, হ্যাঁ, তারে খুব ভালো কইরাই চিনি। তা কি ব্যাপার বলেন তো?

শী ঃ আসলে আমার একটা সার্টিফিকেট দরকার যে, গত সাতদিন ধরে আমি অসুখে শয্যাশায়ী ছিলাম।

হা ঃ কেন, হইছে ডা কি?

শী ঃ (ইতস্তত করে) না মানে আমি অজান্তে একটা দুষ্কর্ম করে ফেলেছি।

তাই পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে...

হা ঃ কিন্তু এডা বড় রিস্কি কাম মিঃ—

শী ঃ শীতল পাল। কিন্তু নবীনবাবু অনেক আশা দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

(গলা নামিয়ে) এর জন্য আপনি যা নেন, তার ডবল দেব।

হা ঃ (খুশী হয়ে) বাবা-বাবা, এই তো কতার মতো কতা। টাকা কামাইতে হইলে রিস্ক নিতেই হইবো। দাঁড়ান মিঃ পাল, প্যাড আর কলমটা বাইর করি।

(হারাধন প্যাডে সার্টিফিকেট লিখতে থাকেন)

তা আপনার বাড়িটা কোথায়?

শী ঃ কোলকাতায়।

হা ঃ কি করা হয়?

শী ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি।

হা ঃ বাবা বেশ ভালো। (হাত বাড়িয়ে) এই নিন আপনার সার্টিফিকেট।

শী ঃ ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, (পকেট হাতড়ে) এই নিন আপনার দক্ষিণা।

হা ঃ ধইন্যবাদ, ধইন্যবাদ, জানেন আমার পোলাও শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে।

শী ঃ ওঃ যাই হোক আমি চলি। (শীতল উঠে চলে যেতে থাকে)

হা ঃ খাঁড়ান না একডু। আসলে আমার খুব কৌতূহল হইত্যাছে। কি করসেন আপনি?

শী ঃ খুন করেছি আমার এক বন্ধুকে।

হা ঃ খুন! কাকে? কেন?

শী ঃ ও আমার প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই একদিন রাত্রে ফাঁকা মাঠে ডেকে পেটে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিলাম।

হা ঃ (বিস্ময়ে) কি নৃশংস!

শী ঃ (ব্যাঙ্গাত্মক হেসে) হ্যাঁ আর তাকে হয়তো আপনিও চেনেন।

হা ঃ (বিস্ময়ে) চিনি? কি নাম তার?

শী ঃ (একটু থেমে) বিপুল ভরদ্বাজ। (কথাটা বলে শীতল চলে যায়। হারাধন প্রথমে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। তারপর চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। স্ত্রী এসে হাজির হয়।)

স্ত্রী ঃ কি হয়েছে? কি হয়েছে তোমার?

হা ঃ জানো ও খুন করসে। খুন করসে আমার পোলারে। (স্ত্রী ও হাহাকার করে ওঠে।) আর ওরে আমিই পুলিশের হাত থিকা বাঁচাইয়া দিলাম। (দুজনেই কাঁদতে থাকে।)

স্ত্রী ঃ কতবার বারণ করেছি শোনোনি। এ তোমারই কর্মফল। তোমারই কর্মফল।

(দুজনে কাঁদতে থাকে। পর্দাপড়ে যায়।)

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

চিঠিপত্র

সানিয়ার শোয়েব-প্রেম

ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা ও ভিনদেশি অর্থাৎ পাক-ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের প্রেম ও নিকাহ (বিয়ে) নিয়ে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি এদেশের মানুষ এখন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। 'মিডিয়া' বা প্রচার মাধ্যম সানিয়াকে নিয়ে মাতামাতির শেষ রাখেনি।

খবরে প্রকাশ, সানিয়ার বর, যাঁর সঙ্গে তিনি ঘর বাঁধতে চলেছেন সেই শোয়েব মালিক নাকি বিবাহিত! বিবাহিত হলে অবশ্য আপত্তি ছিল না।

কেননা ইসলামে দুই বা ততোধিক বিবি রাখার বিধান আছে। কিন্তু শোয়েব সাহেব যে নিজের বিয়েটাকেই অস্বীকার করেছেন। আর গোলমালটা এখানেই। শোয়েব বলেছেন, তিনি কস্মিনকালেও কাউকে বিয়ে করেননি, 'মিডিয়া' যা রটাচ্ছে তা সবই মিথ্যা। তবে হ্যাঁ, হায়দরাবাদের মেয়ে আয়েশার সঙ্গে এককালে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, ভালোবাসাও ছিল, কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈবচ। আয়েশা কিন্তু বলেছেন অন্য কথা। তিনি বলেছেন, ২০০২ সালে শোয়েবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। বিয়েটা হয়েছে অবশ্য টেলিফোনে। তবে নিকাহনামায় তিনি সইও করেছেন। এর পর হায়দরাবাদের একটা হোটেলে তাঁরা এক সঙ্গে রাতও কাটিয়েছেন। তিনি গর্ভবতী হয়েও পড়েছিলেন। কিন্তু সন্তান গর্ভেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিকে আয়েশার বাবা মহম্মদ আলি সিদ্দিকি শোয়েবের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, আয়েশা-শোয়েবের বিয়ে সংক্রান্ত সমস্ত নথি তার কাছে রয়েছে। তিনি স্থানীয় থানাকে সবকিছু জানিয়েছেন। এমন কী আইনি লড়াইয়ের জন্য তৈরিও হচ্ছেন। শোয়েবের মিথ্যাচারকে প্রমাণ করেই ছাড়বেন তিনি। তিনি ও তাঁর পরিবার চান, শোয়েব সত্যটাকে স্বীকার করুন এবং তালাকনামায় সই করে দিন। শোয়েব কিন্তু সিদ্দিকি সাহেবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি। তাঁর কয়েকদিনের লম্ফঝম্ফ অবশেষে মিইয়ে গিয়েছে। অতি চালাকের পড়েছে গলায় দড়ি।

শোয়েব যখন বুঝতে পেরেছেন, মিথ্যে দিয়ে আর সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না, সিদ্দিকি সাহেবের হাতে যথেষ্ট প্রমাণপত্র রয়েছে এবং আইনের জালে জড়িয়ে তাঁকে আদালতে টেনে তুললে সানিয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা কেঁচে যেতে পারে, তখন সুবোধ বালকের ন্যায় আয়েশার সঙ্গে তাঁর বিয়েকে স্বীকার করে নিয়ে তালাকনামায় সই করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আর এর সাদা অর্থ, শোয়েব নিজেকে নিজেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেছেন। আর এহেন এক মিথ্যাবাদীকে জীবনসঙ্গী করেছেন সানিয়া! এক মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চ ককে বিয়ে করে সানিয়া জীবনে কতটা সুখী হতে পারবেন তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে যার 'বিসমিল্লায় গলদ', ভবিষ্যৎ তার সুখের হতে পারে না।

অতঃপর প্রশ্ন উঠেছে সানিয়ার দেশাত্মবোধ নিয়ে। তিনি বিয়ে করলেন একজন পাকিস্তানীকে—যে পাকিস্তান তার জন্ম লগ্ন থেকে ভারত-শত্রু। তবে পাকিস্তানী বিয়ে করে এদেশের কেউ সুখী হননি। একদা অভিনেত্রী রীণা রায় বিয়ে করেছিলেন আর এক পাক ক্রিকেটার মহসীন খানকে। কিন্তু সংসার সুখের হয়নি। রীণা তালাক খেয়ে এক-কন্যাসহ এদেশে এসে আবার ঠাঁই নিয়েছেন। এখন সানিয়ার দাম্পত্য সুখ দেখতে আমরা অপেক্ষায় থাকলাম। সানিয়া দেশকে নয়, ভালোবেসেছেন শোয়েবকে—পাকিস্তানকেই।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

পদত্যাগে না-পছন্দ মন্ত্রী

খবরে প্রকাশ পার্ক স্ট্রীটের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে বৃহস্পতিবার মহাকরণে দমকলমন্ত্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের সামনে মন্তব্য করেছেন, "কোন অবস্থাতেই আমি পদত্যাগ করব না। কারণ, পদত্যাগের কোনও কারণ আমি দেখছি না। কী কারণে আমাকে পদ ছাড়তে হবে? আপনারা বলছেন বলে তাই?" সাংবাদিকরা তাঁকে যখন বলেন, যেভাবে বেঘোরে ৪৩ জনের প্রাণ গেল, তাতে আপনার তো নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে? দমকল ঠিকমতো কাজ করলে আরও কিছু লোকের প্রাণ বাঁচত। পথেঘাটে লোকে বলছে, আপনার পদত্যাগ করা উচিত। এ কথাতে মন্ত্রীমশায়ের গোঁসা আরও বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, আপনারা কী চান? আমি মন্ত্রী হয়ে পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে বেলচা মারব? পদত্যাগ আমি করব না।

তা না করুন মন্ত্রীমশাই। এতে আমাদের মতো আমবাঙালীর কিছু আসে যায় না। কেননা গত ৩২-৩৩ বছরে আমবাঙালী আপনাদের সৃষ্ট বহু মজাদার সার্কাস দেখে আসছে। সংসারে বহু পিতা-মাতাকে তার বখাটে সন্তানদের জন্য কষ্টার্জিত বহু অর্থে গচ্চা দিতে হয়। তাতে পাড়ার লোক বিরূপ মন্তব্য করলেও বাবা-মা নিরুপায় হয়ে থাকেন। আগের দিনে প্রজারা রাজার কাছে ছিলেন সন্তান তুল্য। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করাই ছিল রাজার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এসেছে প্রগতিশীল প্রজাতন্ত্র। অর্থাৎ প্রজারাই রাজা নির্বাচন করে সেই রাজার শাসন প্রণালী মেনে নেবে। সেই অর্থে আমবাঙালী আপনাদের মতো মন্ত্রীদের নির্বাচিত করেছে। কাজেই আমবাঙালীর দেয় অর্থে আপনারা যে রাজা সেজে বাঙালীর কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় করবেন এবং বিপদে আমজনতার কোনও উপকার করতে পারবেন না সেটা বাঙালী মাত্রই জানেন।

পথে ঘাটে লোকে মন্তব্য করছে, প্রতীমবাবু পদত্যাগ না করলে আমবাঙালী লজ্জিত হবেন বইকি, কিন্তু প্রতীমবাবু লজ্জিত হবেন না। কারণ প্রতীমবাবুরা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো নৈতিক দায়িত্বে আস্থাবান নন। নেহেরুমন্ত্রিসভার রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে একটিমাত্র রেল দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আর সেই রেল দুর্ঘটনার (সম্ভবত) পরের দিনই তিনি রেল মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন নৈতিক দায়িত্ব পালন করে। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি রেল দপ্তরের উপযুক্ত মন্ত্রী নন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু মন্ত্রিত্বের চিটেগুড়ে তাঁর পা আটকে ছিল না। পক্ষান্তরে আমবাঙালীর অর্থে কেনা চিটেগুড়ে প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী মন্ত্রীদের শুধু পা নয়, গোটা শরীরটাই আটকে রয়েছে। কাজেই আমবাঙালীর দেওয়া রামধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত বঙ্গীয় কোন মন্ত্রীই পদত্যাগ করবেন না।

—মণীন্দ্রনাথ সাহা, নয়াপাড়া, গাজোল, মালদহ।

বাংলা পঞ্জিকার উৎস

স্বস্তিকার ১৪ চৈত্র ১৪১৬ (২৯.৩.১০) অঙ্কে শ্রীনবকুমার ভট্টাচার্য লিখিত "বাংলা পঞ্জিকার উৎস ও পরম্পরা" রচনাটি পড়ে ভাল লাগল। জ্যোতিষ, বা Astronomy (Not astrology) নিয়ে লেখা সাধারণতঃ খুবই কম। অনেকে Astronomy আর astrology কে একই জিনিষ ভাবেন, যদিও আমার মত্ত্রেব্দব্ধজ্পসপ্তপ্সব্ধভসম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অবিশ্বাসযোগ্য।

আসলে বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়, surya siddhanত্ত গ্রন্থে যার উল্লেখ শ্রী ভট্টাচার্য্য করেছেন, আমি ১৬ বছর আগে লখনউ শহরে হজরতগঞ্জ এলাকার একটি পুস্তকের দোকানে Surya Siddhanত্ত গ্রন্থটি খুঁজে পাই ও কিনে নিই।

সেই গ্রন্থে 'নক্ষত্র' নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষাতে 'নক্ষত্র' শব্দ নিয়ে অনেক ভ্রান্ত কথা লেখা হয়। 'নক্ষত্র' কথাটার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে "ASTERISM"–"star" বা "constellation" নয়।

আরব দেশে এই ২৭টি নক্ষত্রকে "মনজিল" (আশ্রয়) বলা হয়। যার সাথে শ্রী ভট্টাচার্য লিখিত গল্পটি যথেষ্ট মিলে যায়। তবে আরবীয়রা স্বীকার করেন যে জ্যোতিষ শাস্ত্র (Astronomy, astrology òû) তাঁরা ভারত থেকেই জানতে পারেন। কিন্তু Surya Siddhanত্ত-র Rev. Ebeneer Burgess (ইনি একজন আমেরিকান মিশনারী ছিলেন, মহারাষ্ট্রে তাঁর কার্যক্ষেত্র ছিল। সংস্কৃত থেকে ইংরাজী অনুবাদ উনিই করেন) কিন্তু কিছু ইতস্তত করে লিখেছেন ভারতীয় জ্যোতিষ রোম থেকেও অনেক কিছু জেনেছে।

কথাটা আমাদের মেনে নেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। এর নাম দেওয়া হয়েছে "A text book of Hindu Astronomy". ১৯৩৫ সালে বইটা কলকাতাতে reprinted হয়। ১৯৮৯ সালে দিল্লীতে। প্রকাশিত করেন মোতিলাল ববারসী দাস। ১৯৩৫ সালে Calcutta University বইটি re-print করান, যার supervision করেন শ্রী ফণীন্দ্রলালগাঙ্গুলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Pure Mathematics বিভাগ দ্বারা।

এই গ্রন্থের Note-এ এই বাক্যটি আছে—"To the reprint is prefixed an introduction which attempts as tracing the development of the SURYA SIDDHANTA as to its date, authorship and methods according to the most recent researches of the writer : it also aims as showing the independence of the Hindu astronomy of any foreign more specially, the greek source".

শেষে আমি যতদূর জানি, বাংলা ক্যালেন্ডার সম্রাট আকবরের "Revenue Minister" টোডরমল (Todarmal), হিজবী ক্যালেন্ডারের ওপর solar calendar কে superimpose করে তৈরি করেন। উদ্দেশ্য season অনুসারে শস্য (ধান) কাটার সময় নির্ধারণ করা, কেননা খাজনা তখন শস্য দিয়েই মেটানো হোত। কথাটা ঠিক কিনা, শ্রী ভট্টাচার্য বলতে পারবেন।

—অরবিন্দ ঘোষ, নতুন দিল্লী।

জনমত

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

বিজয় দে

হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়াটা খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং ভারতে অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত হিন্দু। কিন্তু মুসলমান ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু হওয়াটা প্রায় নেই বললেই চলে। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ একাধিক। তবে হিন্দু থেকে মুসলিম হওয়ার প্রধান কারণগুলি মনে হয়—

(১) তালাক দিয়ে একাধিক বিয়ে করা যাবে। যেমন কবীর সুমন। (২) মুসলমানের ঘরে ডাকাতি বা জমির ধান লুঠ করতে কোনও হিন্দু সাহস পাবে না।

(৩) মুসলমানের মেয়ে কোনও দিন কোনও হিন্দু কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হবে না।

(৪) কোনও মুসলিম কোনও দিন হিন্দু সমাজবিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

(৫) ধর্মীয় সম্প্রদায়গত ভাবে মুসলমানরা যতটা একত্রিত হতে পারে, হিন্দুরা তা কোনওদিন পারবে না। যেমন তসলিমার ভারত থেকে বিতাড়ন, রিজওয়ানুর বা স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক গ্রেফতার এবং তসলিমার লেখা প্রকাশ নিয়ে কর্ণাটক জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি এবং দুজনের মৃত্যু।

(৬) নতুন সংযোজন মুসলিম সংরক্ষণ।

সুতরাং ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে বেঁচে থাকা মানে প্রতি পদে পদে ঝুঁকি। শক, হুন, পাঠান, মোগল— সকল মুসলিম শাসক এবং পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪৬ সাল থেকে হিন্দুর ওপর নির্মম অত্যাচারের ইতিহাস সবই এর উদাহরণ।

'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'— যতই গাই না কেন, যতই বলি না কেন, 'যত মত তত পথ', 'মেরেছ কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না' বা যতই করি না কেন সর্বধর্ম সম্মেলন, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক যেদিন ভারতবর্ষে প্রথম ইসলাম তথা মুসলমান আক্রমণকারীর প্রবেশ ঘটে সেদিন এবং আজকের সম্পর্ক একই। তফাৎটা হল, সেদিন মুসলমান ছিল বিদেশী, আজ দেশীয়। কিন্তু মানসিকতা একই আছে। পাশাপাশি ছোট দুটি হিন্দু-মুসলমান গ্রামের মধ্যেও একটা পরিষ্কার পার্থক্য এবং বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমনটা লক্ষ্য করা যায় ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে।

এছাড়া দেশ একটা। কিন্তু আইন মুসলমানদের জন্য একরকম আবার বাকিদের জন্য আর একরকম। মুসলমানের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই প্রমাণ করে যে, ভারতের সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ যদি জল হয় তবে মুসলমান হল তেল। দুটি কোনও দিন মিশ্রিত হতে পারে না। অথচ আমরা বলেই চলেছি, 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'।

'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'— গেয়ে পেলাম মুসলিম পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। আজ পর্যন্ত যত দূর জানি, মুসমলান কোনওদিন মন্দিরে যায়নি, হিন্দু কোনওদিন মসজিদে যায়নি। বরং ইতিহাস বলে ভারতে প্রায় সব মুসলমান শাসকই মন্দির ভেঙেছে এবং লুঠ করেছে।

সুতরাং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন অতীতে হয়েছে, আগামীদিনেও যে হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্বব্যাপী যেমন অস্ত্র নির্মাণ, শান্তি সম্মেলন হয় তেমনই আবার প্রত্যেক রাষ্ট্র তার অস্ত্র সম্ভার প্রতিদিনই বাড়িয়ে চলেছে। ঠিক তেমনই আমার মনে হয়, আগামী দিনের কথা ভেবে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে বাঁচার প্রয়োজনে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে যে দুর্বল হবে তাকেই কচুকাটা হতে হবে। হতে হবে অনুপ্রবেশকারী বাস্তুচ্যুত, এবং সেই সম্প্রদায় হবে জীবাশ্মমাত্র। যেটা আজকের ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র এবং খৃস্টান রাষ্ট্রে হিন্দুদের অবস্থা।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ -২০১০

।।হরিদ্বার থেকে ফিরে শচীন্দ্রনাথ সিংহ।।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভপর্ব চলছে। শুরু হয়েছিল ১৪ জানুয়ারী, মকর সংক্রান্তির দিন। শেষ হবে ২৮শে এপ্রিল। সূর্যদেব মেষরাশিতে এবং বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে অবস্থানকালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়ে থাকে। প্রতি বারো বছর অন্তর এই কুম্ভস্নান উপলক্ষে বিরাট আয়োজন হয়ে আসছে। এই হরিদ্বারের কাছে কনখলেই একদিন পদগর্বে মত্ত রাজা দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে শিবনিন্দা করায় পতিপ্রাণা সতী দেহত্যাগ করেন। ভগীরথের ঐকান্তিক সাধনায়, সাগরবাজার সন্তানদের দুঃখে বিগলিতা পতিতপাবনী গঙ্গা এখানেই মর্ত্যে অবতরণ করেন। এখানেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যে, পবিত্রতায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে হরিদ্বার হলো—"হর কী দ্বার।" দশ কিলোমিটার লম্বা প্রায় এক কিলোমিটার চওড়া, একদিকে পতিতপাবনী জাহ্নবী অপর দিকে গগনচুম্বী হিমালয় পর্বতমালা—এই ক্ষেত্রটিতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভমেলা।

গত ৯ই এপ্রিল কুম্ভ নগরটিতে পালিত হলো ঐতিহাসিক বন্ধ। যে কুম্ভপ্রাঙ্গণ সদাসর্বদা ভজনকীর্তন, পূজাপাঠ, প্রবচন ও ঘণ্টাধবনিতে মুখরিত থাকত, চলত আখড়ায় আখড়ায় সন্তদের সহভোজন (ভান্ডারা), ৯ তারিখে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। কুম্ভের ইতিহাসে নাকি এমনটি কখনও ঘটেনি। আখড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত জ্ঞানদাস জানালেন, মা গঙ্গার পবিত্রতা নির্মলতা, অবিরলধারা বজায় রাখার জন্য গঙ্গা রক্ষার দাবিতে এই প্রতিবাদ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মা গঙ্গাকে বেঁধে ফেলা অন্যায়, এর ফলে গঙ্গা একদিন দুর্গন্ধ জল বহনকারী নালায় পরিণত হবে। এই দিন বৈরাগী ক্যাম্প, গৌরীশংকর, নীলধারা, দক্ষদ্বীপ প্রভৃতি সেক্টরে ঘুরে দেখলাম গঙ্গারক্ষার দাবীতে সমস্ত ক্যাম্পে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

৬ এপ্রিল মঙ্গলবার নির্বাণী আনী আখড়া (বৈরাগী ক্যাম্প) প্রাঙ্গণে সন্ত মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সেই সম্মেলনে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ করার সংকল্প পূরণ করার জন্য জাগরণের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সন্ত সম্মেলনে গো-রক্ষা ও গঙ্গারক্ষার জন্য বিভিন্ন আখড়ার সাধুসন্তরা বক্তব্য রাখেন। জগৎগুরু শংকরাচার্য বাসুদেবানন্দজীর সভাপতিত্বে সন্ত সম্মেলনে সাধুসন্ত ও ভক্তদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিশালমঞ্চে দেশ-বিদেশে কর্মরত প্রায় দুই শতাধিক প্রমুখ সন্ত, কানায় কানায় ভরপুর সভাস্থল মাঝে মাঝে গঙ্গা ও গো-রক্ষার জয়ধবনিতে মুখরিত। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি শ্রীঅশোক সিংঘল বলেন, গোস্বামী তুলসীদাস জয়ন্তী ১৬ আগস্ট ২০১০ থেকে তিনমাস, গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায়, মন্দিরে হনুমন্ত শক্তি জাগরণের জন্য সাধু-সন্তদের নেতৃত্বে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হবে। অনুষ্ঠানের মধ্যে নামসংকীর্তন, হনুমানচাল্লিশা পাঠ এবং শ্রীরামজন্মভূমিতে সুরম্যমন্দির নির্মাণ করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করা হবে। দেবথান একাদশী থেকে গীতাজয়ন্তী অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রখণ্ডে (ব্লক) শ্রীরাম যজ্ঞ ও ধর্মসভার আয়োজন করা এবং সমবেত ভক্তদের দিয়ে হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা হবে। শ্রী সিংহল আরও বলেন, রামজন্মভূমির মামলা ৬০ বছর ধরে আদালতে চলছে। এটা আদালতের বিষয় নয়। পার্লামেন্টে আইন তৈরি করা ছাড়া রামমন্দির নির্মাণের আর কোনও রাস্তা খোলা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। স্বামী ঋতম্ভরা, মহন্ত জ্ঞানদাসজী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

এবারের কুম্ভমেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি রাখেনি উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। হর কী পৌড়ি দ্বীপের সঙ্গে কয়েকটি পাকা পুল তৈরি করে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। সুরক্ষা কর্মীরা মেটাল ডিটেকটর দিয়ে অনবরত তল্লাসীর ব্যাবস্থা করে চলেছেন। বিশেষ করে জল, স্বচ্ছতার ব্যাপারে সজাগ প্রশাসন। অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে সহজে ছোট ক্যাম্পগুলিতে ঢুকতে পারে। বারবার মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে সতর্কতা বজায় রাখার জন্য। মেলাপ্রাঙ্গণে দুপুরে গরম হাওয়া চলতে থাকে। তাই সকাল সকাল ক্যাম্পগুলিতে রান্না সেরে নেওয়ার জন্য আগ্রহ করা হচ্ছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এবং হাজার হাজার বাহনকে পুলিশ কর্মীরা ব্যারিকেটের মাধ্যমে দিনের পর দিন যেভাবে নিষ্ঠা সহকারে নিয়ন্ত্রণ করছেন তা দেখার মতো। আলোক মালায় সুসজ্জিত ১০ কিমি গঙ্গার ঘাট। জলের স্রোতে কেউ যাতে না ভেসে যায় তার জন্য লোহার বেড়া। জলপুলিশের সতত শ্যেন দৃষ্টি। স্নান চলে প্রায় সারাদিন। বিশেষ কোনও তিথি থাকলে রাত্রেও পুণ্যস্নানের বিরাম থাকে না। আস্থা ও বিশ্বাসকে সম্বল করে যখন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ডুব দিচ্ছে, তার মধ্যে আমিও সকাল সকাল অবগাহন করলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল। বরফগলা জলের মতো। জল থেকে উঠে কিন্তু খুবই ফ্রেস লাগছিল, হয়ত মনের কুম্ভ পূর্ণ হয়েছে তাই!

কুম্ভমেলায় মূল আকর্ষণ থাকে যেমন স্নান, তেমনি ভারতবর্ষের নানাস্থান থেকে আসা বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদেব সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা। সাধু সম্মেলনই কুম্ভমেলার প্রাণ। কথা হচ্ছিল হুগলী জেলা থেকে আসা ইনচুড়ার স্বামী যোগানন্দজীর সঙ্গে। ভোলাগিরি সম্প্রদায়ের মহারাজ গত চার মাস ধরে মেলায় অস্থায়ী ক্যাম্প করেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রীদের জন্য রেশনমূল্যে পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহে মহারাজ খুশী। চাল, আটা, ডাল, চিনি, কেরোসিনের কোনও অভাব নেই। চিনি এই বাজারে প্রতি কিলো মাত্র ১৩ টাকা মূল্যে পাচ্ছেন। কুম্ভনগরীতে লোডশেডিং-এর ছুট্টি। এছাড়া এবারের কুম্ভে বর্দ্ধমানের সোহমবাবাও খুব পরিচিত নাম। আমাদের দেশে যখন যাতায়াতের জন্য আধুনিক বাহন ছিল না, বড় বড় রাস্তাঘাট ছিল না, আধুনিক প্রচার মাধ্যম ছিল না তখন লোকেরা পায়ে হেঁটে যাত্রা করতেন। মেলা পর্বে একত্রিত হতেন, তীর্থযাত্রা করতেন। এইভাবে আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতভূমিতে সম্পর্ক স্থাপিত হোত। কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে সারাদেশের মানুষ একত্রিত হতেন, সংবাদ আদান প্রদান হোত। একাত্মভাব নিয়ে নিজ নিজ স্থানে ফিরতেন। তখন এই রকম বিধান ছিল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কুম্ভে একত্রিত হতেন। সাধুসন্ত, ঋষি-মুনি, ধর্মাচার্যরা পরস্পর একত্রিত হয়ে সমাজের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন। দোষ, গুণ নিয়ে চর্চা হোত। পরামর্শের মাধ্যমে যুগানুকূল নীতি নির্ধারণ করা হোত। একে বলা হয় "ধর্মসংসদ"। ধর্মসংসদ সমাজের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হোত। আদি শংকরাচার্যের সময় থেকে রাজা হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত কুম্ভমেলা উপলক্ষে প্রায় আটশত বছর এই ব্যবস্থাই চলে আসছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিভিন্ন সময়—কুম্ভমেলাকে কেন্দ্র করে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর্তাদের সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এবার

(এরপর ১৪ পাতায়)

জন্ম মৃত্যুর চক্র

চৈতালী চন্দ

আমাদের শরীর পাঁচ তত্ত্ব (পঞ্চ ভূত) দ্বারা তৈরী। আমাদের শরীরে আত্মাই প্রধান। আত্মা ও শরীরের সম্পর্ক গাড়ী ও ড্রাইভার। খাঁচা ও পাখী, ক্যাসেট ও টেপ। আমাদের শরীর আত্মার বস্ত্র। এটা গীতারই কথা। যতক্ষণ শরীরে আত্মা থাকে, ততক্ষণ মানুষ জীবন্ত। আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীর থাকা সত্ত্বেও সে হয় মৃত। তারপর তার শরীর আবার পাঁচ তত্ত্বেই মিশে যায় (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম)। আত্মা আবার শরীর ধারণ করে এই ধারায় আসে— আবার জীবন শুরু হয়। এভাবেই চলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। শরীর পাঁচ তত্ত্বে মিশে গেলেও আত্মার মৃত্যু নেই, আত্মা অমর।

কাজেই জীবন হল মৃত্যুরই প্রস্তুতি। যদিও মৃত্যু এক স্বাভাবিক ঘটনা, তবুও এটি সাধারণ মানুষের কাছে একটি আতঙ্কের বিষয়। জন্মের পর থেকে আমরা এক পা এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু মৃত্যুকে আমরা ভীষণ ভয় পাই। কারণ, মৃত্যু আমাদের আলো থেকে অন্ধকারে, জানা থেকে অজানার পথে নিয়ে যায়। অনুসন্ধিৎসু মন তাই প্রশ্ন করে, কেন তাহলে আমাদের এখানে আসা?

যখন আমরা কারও মৃত্যু দেখি, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, যে মানুষটি এক ঘন্টা আগেও বেঁচে ছিল সে কোথায় গেল? যে আত্মাকে আমরা অজর-অমর বলে জানি সে মুক্ত হবার পর কোথায় গেল? আত্মা তো শরীর ধারণ করে, কিন্তু কিভাবে? এবং কখন আত্মা শরীর পায়?

এসব প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষের কাছে অজানা থেকে যায়। তবে ঈশ্বরীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা যতটুকু জ্ঞান সংগ্রহ করেছি, তার ভিত্তিতে বলতে পারি, ঈশ্বর মানুষের হাতের কর্মরূপী কলম দিয়েই তার ভাগ্যরেখা টেনে দেন। এই সৃষ্টিচক্র ৫০০০ বছরের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারটি যুগ চক্রাকারে ঘুরছে। প্রত্যেক যুগের মেয়াদ ১২৫০ বছর। অর্থাৎ ১২৫০ দ্ধ ৪ ৫০০০ এই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বছর পর সৃষ্টির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পরিবর্তিত হয়।

সত্যযুগ-এ আমরা ৮ বার জন্ম নিয়েছি। ত্রেতাযুগে আমরা ১২ বার জন্ম নিয়েছি। দ্বাপর যুগে আমরা ২১ বার জন্ম নিয়েছি। কলি যুগে আমরা ৪২ বার জন্ম নেবো।

বর্তমানে আমরা সঙ্গমযুগে এসেছি। সঙ্গমযুগে ১ বার আমরা জন্ম নিই। অর্থাৎ মোট ৮৪ বার আমরা জন্ম নিয়েছি। এই পাঁচহাজার বছরের মধ্যে যে কয়েকবার আমরা জন্ম নিয়েছি তা আমাদের অতীত কর্ম অনুযায়ীই হয়েছে। এটা আমাদের আশীর্বাদ যে আমরা অতীত জন্মের কথা ভুলে যাই। মৃত্যু আমাদের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। মৃত্যুর ক্ষেত্রে রাজা ও ফকিরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

তাই যখন কিছুদিনের জন্য এখানে আসা তখন কেন মিথ্যে মোহ রাখা? মৃত্যু যখন একদিন সব ছিনিয়ে নেবে তখন এই বিনাশী পৃথিবীর সাময়িক সুখে নিমজ্জিত না থেকে মৃত্যুকে অভিনন্দন করাই উচিত। কারণ, মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, এক নতুন জীবনের আরম্ভ। জীবন ও মৃত্যু একই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ। এই চক্র চলতেই থাকবে।

ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান

এক গ্রামে একজন কৃষক বসবাস করত। কৃষক প্রতিদিন রাত্রিতে তার ছেলেকে গল্প শোনাত। একদিন কৃষক ছেলেকে বলল, 'বাবা, একটা কথা কখনও ভুলবে না যে, ভগবান সর্বত্র আছেন।' ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কই, আমি তো ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না?' কৃষক উত্তর দিল, 'আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না, কিন্তু উনি সব জায়গায় আছেন আর আমাদের সব কাজ দেখতে পান।'

কৃষকপুত্রের মনে একথা গেঁথে রইল। একবার দেশে আকাল দেখা দিল। সেবার কৃষকের ক্ষেতে কোনও ফসল হয়নি। সে একদিন রাতের বেলা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পাশের গ্রামে গেল। মতলব ছিল, একবোঝা ধান কেটে নিয়ে আসবে। ছেলেকে আলের মাথায় দাঁড় করিয়ে রেখে বলল, 'তুই চারদিক লক্ষ্য রাখ। যদি এদিকে কেউ আসে তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দিবি।'

বোধ কথা

যেই না কৃষক ধান কাটতে বসেছে অমনি তার ছেলে বলে ওঠল—'বাবা! থাম।' কৃষক জিজ্ঞাসা করল, 'কেন রে? কেউ দেখছে নাকি?"

কৃষকপুত্র বলল, 'হ্যাঁ, দেখছে।' কৃষক ক্ষেত থেকে উঠে এসে চারদিকে নজর করল। কোনওদিকে কাউকে দেখতে না পেয়ে ছেলেকে বলল, "কইরে, কেউ তো নেই। কে দেখছে?' ছেলে বলল, 'তুমিই তো বলেছিলে, ভগবান সর্বত্র আছেন। আমাদের সব কাজ দেখছেন, তাহলে ভগবান তোমাকেও ধান চুরি করতে দেখছেন।' ছেলের কথা শুনে কৃষক খুবই লজ্জা পেল। তাই সে ধান চুরি না করেই ফিরে এল।

ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সর্বত্র এই বোধ হলে মানুষ কারও অগোচরেও অন্যায় করতে পারবে না। তবে এই বোধ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বেশ কঠিন।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।। ৮

সার্বভৌমের জামাই অমোঘ মহাপ্রভুর নিন্দা করত। একদিন কলেরায় তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মহাপ্রভুর স্পর্শে তার রোগ দূর হয়ে যায়।

পুরী থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে নবদ্বীপে এসে মাকে প্রণাম করলেন। ধর্মপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজের পাদুকা দান করলেন।

বৃন্দাবনের পথে জঙ্গলে মহাপ্রভুকে দেখে হিংস্র পশুরাও হিংসা ভুলে গেল। মহাপ্রভু সস্নেহে তাদের মাথায়-গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

মন মনিটর

মানুষের মনের জগতে এবার ঢুকে পড়ল কম্পিউটার। ফলে মনের গোপন কথাটি রবে না গোপনে। ফুটে উঠবে মনিটরের স্ক্রিনে। ব্রেন স্ক্যান করে মনের কথা পড়তে পারবে যন্ত্র। স্ক্রিনে ফুটে উঠবে সেই মুহূর্তের ভাবনার ছবি।—এম আর আই স্ক্যান পদ্ধতিতে এই মনস্তাত্ত্বিক কম্পিউটার আবিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন লন্ডনের একদল বিজ্ঞানী। মূকের প্রকাশ ভঙ্গিতে সহায়তা করবে এই আবিষ্কার। ব্রেন ম্যাপিং আরও পোক্ত হবে।

ভয়ের গন্ধ

কেউ ভয় পেলে তার ঘামের গন্ধেই তা ধরা পড়ে। কারণ ওই মুহূর্তে শরীর থেকে এক ধরনের ফেরোমন নিঃসৃত হয়। সম্প্রতি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন বিজ্ঞানী গন্ধ-বিচারের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। জঙ্গি অপরাধী ধরতে এর নাকি জুড়ি নেই। বাহ্যত চোখ মুখ যতই শান্ত দেখাক, কেউ অপরাধ করতে গেলে বা করলে তার শরীরে সেই ভয়ের ফেরোমন নিঃসৃত হয়ই। আর ওই যন্ত্রই সেটা সহজে ধরতে পারবে।

বায়োনিক আই

অন্ধজনের দৃষ্টি ফেরাল 'বায়োনিক আই'। তিরিশ বছর পর দৃষ্টি ফিরে পেলেন পিটার লেন এবং আরও ৩১ জন, যাঁদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন লন্ডনের ম্যাঞ্চেস্টার রয়্যাল আই হাসপাতালের গবেষকরা। 'বায়োনিক আই' হলো বিশেষ ধরনের অতি উন্নত এক মাইক্রোচিপ। রেটিনার পাশে মণির ঠিক পেছনে অস্ত্রোপচার করে লাগানো হয়। এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি সূক্ষ্ম তারের মাধ্যমে প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। বায়োনিক আই যিনি ব্যবহার করবেন, তাঁকে এমন একটি চশমা পরতে হবে, যার সঙ্গে চার্জার-ব্যাটারিসহ একটি ট্রান্সমিটার লাগানো থাকে। এই ট্রান্সমিটার আলো পাঠিয়ে দেয় মাইক্রোচিপে। সেখান থেকে পৌঁছে যাবে মস্তিষ্কে। ফলে সেই ব্যক্তি দেখতে পাবেন।

মগজের কাজ

হঠাৎ মনে হলো কিছু শুনলেন! এ কোনও ভুতুড়ে ব্যাপার নয়, মগজের চাতুরি। ছেঁড়া ছেঁড়া ধ্বনি, শব্দ নিজের মতো করে সম্পূর্ণ করে নেয় মানুষের মস্তিষ্ক। না হলে তুমুল আড্ডায় বা প্রবল আওয়াজের মধ্যে কারও কথাই কেউ বুঝতে পারত না। নেদারল্যান্ডসের মাসট্রিক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বের করছেন টুকরো ধ্বনি সম্পূর্ণ করে নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে মস্তিষ্কের।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

রবি ঃ বলতো পাঞ্জাবের জাতীয় পাখি কী?

শশী ঃ কেন তন্দুরি চিকেন!

* * *

পি.এ ঃ স্যর, অনেক পুরনো চিঠিপত্র জমে গেছে। ওগুলি কি নষ্ট করে ফেলব?

ম্যানেজার ঃ করতে পারেন, তবে দু'কপি করে জেরক্স করে রাখবেন।

* * *

ডাক্তার ঃ গত মাসে আপনার যা ওজন ছিল এমাসে দেখছি দু'কেজি কম। ওষুধে কাজ দিচ্ছে তাহলে!

রোগিণী ঃ এমাসে মেক-আপ করে আসিনি তো।

* * *

মা ঃ হ্যাঁ-রে, এত যে গানের রিয়ালিটি-শো দেখে বেড়াস, কোন্ গানটা রক আর কোন্টা জ্যাজ বুঝিস?

ছেলে ঃ হ্যাঁ, যেটায় লোকে কোমর নাড়ায় সেটা রক আর যেটায় মাথা নাড়ায় সেটা জ্যাজ।

* * *

—পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ-নীতি চালু করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

—আপনারা পিছিয়ে-পড়া সরকারের কথাটাও মনে রাখবেন, সামনেই তো ভোট!

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য থাকলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন কে?

২। শকাব্দের শেষ মাস কোন্‌টি, চৈত্র, পৌষ না ফাল্গুন?

৩। জুয়ান মার্টিন দেল পোত্রো কোন্ দেশের টেনিস তারকা?

৪। 'ব্যাবক টেস্ট' দিয়ে দুধের কোন্ উপাদানের পরিমাণ যাচা করা হয়?

৫। অসুস্থ সত্যজিৎ রায়ের লাইফ-টাইম অস্কার পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য কাকে মনোনীত করা হয়েছিল?

—নীলাদ্রি

উত্তরঃ

১। ভারতের প্রধান বিচারপতি
২। ফাল্গুন
৩। আর্জেন্টিনা
৪। ফ্যাট
৫। অভিনেত্রী অড্রে হেপবার্ন-কে

উত্তর দিনাজপুরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

গত ৯ থেকে ১২ এপ্রিল উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বড়দহী গ্রামে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির তিনদিনের একটি শিবির পরিচালিত হয়। মোট ১৫টি গ্রাম থেকে ৬৮ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে প্রশিক্ষণ লাভ করে। শিক্ষিকা ও অধিকারী মিলিয়ে শিবিরে মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৮২ জন।

নানা সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এখানে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির তিন দিনের শিবির সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই শিবিরে বৌদ্ধিক বর্গে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ-সম্পাদক নকুল চন্দ্র খাঁ। ১১ তারিখ বিকালে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ সহকারে পথসঞ্চলন করেন। এই সমারোপ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সীমা জনজাগরণ মঞ্চ সংযোজক উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব প্রাপ্ত মটুকেশ্বর পাল। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ সম্ভাগের সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

রিষড়াতে নাগরিক বর্গের আলোচনা-চক্র

গত ২ এপ্রিল সন্ধ্যায় রিষড়া সঙ্ঘ কার্যালয় জ্যোতির্ময় ভবনে হুগলী জেলার বিভিন্ন চিন্তাশীল নাগরিক বর্গের এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও হিন্দুত্বের বিপদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ বিষয়ে ভূমিকা করে আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রায় ৪০ জন নাগরিক তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্যে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করেন।

সংঘের ৮৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন কাজে সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন ও প্রভাব পড়েছে, কেন হিন্দু সংগঠন ছাড়া দেশ জাগবে না, কেন হিন্দু সংগঠনকে সাম্প্রদায়িক শক্তি বলা হচ্ছে, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে কুৎসিত হাসি- তামাসা করা হচ্ছে, ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ কেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। জাগ্রত হিন্দু সমাজের জন্যই "অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড" তার অধিকার ফিরে পেয়েছে, সরকার রামসেতু রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে, গঙ্গা নদীকে জাতীয় নদী বলে ঘোষণা করতে হয়েছে। "হিন্দু জাগে তো দেশ জাগে," একথা সকলেই স্বীকার করেছেন।

রাজনীতির কচকচি ও কুৎসা সরিয়ে রেখে হিন্দুত্বের দীপশিখা জনসমাজে প্রজ্জ্বলিত করার আহ্বান জানিয়ে আলোচনা সভা সমাপ্ত হয়।

দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদীদের সি আর পি এফ জওয়ান হত্যার প্রতিবাদে ঘটনার পরদিন কলেজ স্ট্রীটে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিদ্যার্থী পরিষদের।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের রাজ্য সম্মেলন

গত ২৮ মার্চ কলকাতায় কেশব ভবনে ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের ১৯তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আর-এস-এস-এর প্রবীণ প্রচারক রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক। সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা হিসাবে দু'টি বিষয় আলোচিত হয়। প্রথম বিষয় হলো—সংযম স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান অবলম্বন। দ্বিতীয় বিষয় ছিল—সোরা আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। আলোচনা করেন যথাক্রমে ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, ডাঃ নির্ঝর অধিকারী, ডাঃ পার্থ কুণ্ডু ও ডাঃ সুকুমার মণ্ডল। সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। এই স্মরণিকায় অন্য বিষয়গুলির সাথে সোয়াইন-ফ্লুর উপর একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে যা উল্লেখের দাবী রাখে।

সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপনোৎসব

নবদ্বীপ সংস্কৃত পরিষদ-পরিচালিত সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের তৃতীয়-দীক্ষার সমাপ্তি-উৎসব হলো গত ৮ এপ্রিল।

অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বিশিষ্ট সমাজসেবী বৃন্দাবনধর গোস্বামী ও ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করেন শিক্ষার্থী পিংকু রাজবংশী। স্বাগত ভাষণ দেন সংযোজক ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের কার্যক্রম আকর্ষণীয় ছিল। প্রথমে সরস্বতী বন্দনা করেন প্রিয়াংকা ব্যানার্জী, রামায়ণের শ্লোক-আবৃত্তি করেন সমবেতভাবে-প্রিয়াংকা, অপর্ণা, রূপা ও পরানন্দা। শ্রীরামের ভজন পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা পরানন্দা নন্দী। কেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে শ্যামল দেবনাথ ও সর্বাণী চক্রবর্তী। প্রশিক্ষক ছিলেন জয়ন্ত দেবনাথ। ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য।

সমাবেশ সমাচার

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কালিম্পং জেলার জেলা কার্যবাহ সমীর কুমার ঘোষের বিবাহ উপলক্ষে, তাঁর বাবা কুবের চন্দ্র ঘোষ সমাজের সেবা কাজের জন্য 'মঙ্গল নিধি' হিসাবে ৩০০১ (তিন হাজার এক) টাকা সিকিম বিভাগ প্রচারক বাদল দাসের হাতে তুলে দেন। 'ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের' পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ সম্পাদক অনিল রায়, দার্জিলিং জেলা প্রচারক রতন জ্যোতি রায়, লোকরাজ অগ্রওয়াল প্রমুখ কার্যকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি নিমতার মাতৃভবনে আয়োজিত জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, জয়দীপের পিতা জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎ বসুমল্লিকের হাতে মঙ্গলনিধি স্বরূপ ১০০১ টাকা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের ২৪ পরগণা বিভাগের কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক দেবব্রত মালাকার (বাবু) সোমা রায়ের সঙ্গে তার বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি বাবদ ৫০১ টাকা প্রদান করেন। বেলঘরিয়ায় যতীন দাস নগরের সংহতি ক্লাবের মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বয়ংসেবকরা ও সমাজসেবা ভারতীর কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

সেবা ভারতীর পরিচালনায় গত ১৩ ও ১৪ মার্চ দু'টি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার ও তুফানগঞ্জের সারদা শিশু মন্দিরে। ওই দুটি শিবিরে ডাঃ বি. সি. সাহা ৪৫ জন রুগীর ইঞ্জেকশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন। এছাড়া সেবা ভারতীর পরিচালনায় ২১ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত চারদিন যথাক্রমে বহরমপুর, দেবগ্রাম, তেহট্ট ও করিমপুরে একইভাবে অর্শ চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়। সেখানেও ডাঃ বি সি সাহা ইনজেকশন পদ্ধতিতে মোট ৯৭ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। ওই চারটি শিবিরে বিশ্বনাথ সাহা উপস্থিত থেকে শিবির হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রমুখ পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

শোক সংবাদ

গত ৮ এপ্রিল আশালতা দেবী ডানকুনির নিজস্ব ভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯৩ বছর। তিনি পাঁচ পুত্র, তিনি কন্যাসহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন সভাপতি তথা বিশিষ্ট লেখক এন সি দে-র তিনি মাতৃদেবী।

* * *

মেদিনীপুর জেলায় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ও সংস্কার ভারতীর জেলা-সভাপতি তথা চিত্রশিল্পী ও লেখক ডাঃ বাসুদেব রায় গত ১২ এপ্রিল পরলোক গমন করেন। স্ত্রী সহ পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যাকে রেখে গেছেন তিনি।

বামফ্রন্ট সরকার ও মাদ্রাসা শিক্ষা

(৩ পাতার পর)

দেশের শাসনকর্তা মুসলমান সে দেশকে বলে দারুল ইসলাম এবং যে দেশের শাসন কর্তা অমুসলমান সে দেশকে বলে দারুল হারব। শক্তিশালী মুসলিম শাসকের কর্তব্য হচ্ছে দারুল হারবকে দারুল ইসলামে পরিণত করা। এই কাজের জন্য তিনি জিহাদের ডাক দিতে পারবেন। প্রত্যেকটি সক্ষম মুসলমান এই ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য। জিহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান যদি কোনও মুসলমান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে যত পুণ্যের কাজ করুক না কেন মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে জিহাদে গিয়ে মৃত্যু বরণ করলে সে তৎক্ষণাৎ স্বর্গে চলে যাবে। তাকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। (দেওবন্দী চিন্তাধারায় 'দ্বীনি মাদ্রাসা' নামে এক প্রকার মাদ্রাসা আছে। এই সব মাদ্রাসায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে শেখানো হয় জেহাদ তত্ত্ব এবং তার মাহাত্ম্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তখন পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল জিয়াউল হক পাক-আফগান সীমান্ত বরাবর অনেকগুলি দ্বীনি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই সব মাদ্রাসায় যে সব জিহাদি তৈরি হয় তারা সরাসরি স্বর্গে গিয়ে চিরযৌবনা ও পীনোন্নত পয়োধরা হুরীদের সঙ্গে চিরশান্তিতে বসবাস তথা যখন তখন সহবাস করার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ভালবাসে।)

(জ) পৃথিবীতে একমাত্র মহাসত্য হচ্ছে ইসলাম। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ার সব মানুষকে মুসলমান বানানো। প্রথমে ভদ্রভাবে অমুসলমানদের মুসলমান হবার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। এই আহ্বানে সাড়া না দিলে তাদের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ' শুরু করতে হবে। এই ধর্মযুদ্ধের নাম 'জিহাদ' বা 'জেহাদ'।

(ঝ) প্রত্যেকটি মুসলমান, এমনকী মৃত্যুর এক মুহূর্ত আগেও যে মুসলমান হয়েছে, সেও শেষ পর্যন্ত স্বর্গে যাবে।

(ঞ) আল্লাহ্ হজরত মহম্মদ সহ মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে। এদের মধ্যে একজনও ভারতে জন্ম গ্রহণ করেননি।

॥ মুসলমান বা অমুসলমান কেউই যে সব কথা বলতে পারবে না এবং যে সব কাজ করতে পারবে না ॥

১। ইসলাম, আল্লাহ্ এবং নবীর বিরূপ সমালোচনা করা যাবে না। কোনও মুসলমান এমন কাজ করলে তাকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

২। আল্লাহ্‌র বাণী কোরান এবং নবীজীর বাণী হাদিসে কোনও খারাপ বিধান আছে—এমন কথা বলা যাবে না।

৩। ইহুদি এবং খৃষ্টানদের বন্ধু বলে গ্রহণ করা যাবে না।

৪। নিজের মা-বাবাকেও বন্ধু বলে গ্রহণ করা যাবে না যদি তারা অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৫। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কেন অনেক আগেই কোরান পাঠান নাই—এমন প্রশ্ন করা যাবে না।

৬। কোনও মুসলমান মহিলা যে কোনও সময় তার স্বামীর যে কোনও ইচ্ছা পূরণে বিন্দুমাত্র দেরী করতে পারবে না।

৭। শান্তির ধর্ম ইসলাম পৃথিবীর কোথায় কোথায় শান্তি স্থাপন করতে পেরেছে—এমন প্রশ্ন করতে পারবে না কেউ।

৮। নবীজী রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক বাহিনীর প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়েও কেন আরব থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারলেন না, সে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

সুধী পাঠকবৃন্দ, আমরা নিবন্ধটির শুরুতে বর্তমানে দিল্লীতে স্বেচ্ছানির্বাসিত বাংলাদেশের মুক্ত মনের লেখক সালাম আজাদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। শেষ করছি কলকাতার প্রখ্যাত মুসলিম প্রকাশনা সংস্থা 'হরফ' প্রকাশনীর 'মুসলিম পঞ্জিকা' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে।

মুসলিম দুনিয়ায় প্রতি শুক্রবার জুম্‌আ নামাজের পরে, ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহায় খুতবা পাঠে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র কাছে যা বলেন—

"হে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদয়াতী ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ্! যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন,...হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে সর্ব দিক দিয়া সাহায্য করুন,...হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারি দ্বারা—বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। ...হে আল্লাহ্! আপনি ধ্বংস করুন, কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোশরেকদের।" (দেখুন-কলকাতার 'হরফ' প্রকাশিত 'মুসলিম পঞ্জিকা', বঙ্গাব্দ-১৪০৭, পৃ-১৬০)

এখন আমাদের প্রশ্ন—সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকায় দান-ছত্র খুলে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষায় যে পরিবর্তন আনার কথা বলছেন তা কি আদৌ সম্ভব? আমরা বলছি মোটেই সম্ভব নয়। অসীমবাবু খুব পরিচ্ছন্নভাবে মুসলিমদের বুঝিয়ে দিলেন আমরা কত দুর্বল। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বাম সরকারকে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের সাবধান বাণী আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই—তোষণের কোনও সীমারেখা নেই।

সংস্কার ভারতী আয়োজিত

বৈজুবাওরা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত মহোৎসব

তিলক সেনগুপ্ত।। অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সংস্কার ভারতী'র উদ্যোগে উদযাপিত হয়েছিল—বৈজু বাওরা রাষ্ট্রীয় সংগীত মহোৎসব। তিনদিন ব্যাপী সংগীত উৎসবের আসর বসেছিল মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী ভোপাল শহরে। গত ৫, ৬, ৭ ফেব্রুয়ারী ভোপালের ঐতিহ্যমণ্ডিত রবীন্দ্রভবন সভাকক্ষে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

মঞ্চে ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত সাধক বৈজু বাওরা প্রতিকৃতি ও সংস্কৃতির আদি গুরু নটরাজ এর চিত্র দর্শকদের আকর্ষিত করে। মঞ্চে শ্বেতশুভ্র সরস্বতী মূর্তির সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিশিষ্ট অতিথি। উদ্বোধনী সত্রের মঞ্চে চাঁদের হাট—উজ্জ্বল অতিথি রূপে উপস্থিত মধ্যপ্রদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী লক্ষীকান্ত শর্মা, প্রবাদপ্রতীম শাস্ত্রীয় শিল্পী সৈফুদ্দিন ভাগরজী, প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী সুলোচনা বৃহস্পতি, সংস্কার ভারতীর সংরক্ষক যোগেন্দ্রজী, রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত প্রমুখ অলকা রেসবুড, রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক কামতানাথ বৈশম্পায়ন সহ বিশিষ্ট অতিথি বর্গ। উদ্বোধনী সত্রে প্রখ্যাত শিল্পী সৈফুদ্দিন ভাগরজী বলেন— সংস্কার ভারতী বৈজুবাওরা সঙ্গীত মহোৎসবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের পরম্পরাগত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও সুরের বিকাশে আত্মমগ্ন হয়ে কাজ করছে। যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবজ্জ্বল দিন।

উদ্বোধনী সত্রে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হলো স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল ১৩ জন শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সঙ্গীত প্রেমী মানুষজন এই সংগীত মহোৎসবে উপস্থিত হন।

সঙ্গীত ও সুরের লহরীতে ভাসলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত ২ হাজার কলা সাধক। ভোপালের প্রখ্যাত ভায়োলিন বাদক শ্রী প্রবীণ শেবলীকর সুরের ঝঙ্কার তোলেন তার অনুষ্ঠানে। তৎপরে দিল্লী থেকে আগত শিল্পী শ্রীমতী সুলোচনা বৃহস্পতিজী সংগীত পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে প্রভাতী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঞ্চ য় দেবলেজী ও তার সম্প্রদায়। সঙ্গীত এর উপর ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেন মুম্বাই থেকে আগত ডাঃ গোবিন্দরাও কেতকারজী। সঙ্গীত সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন চিত্রকূটে শ্রীরাম শঙ্করজী। বংশী-ধূন পরিবেশন করেন ব্যাঙ্গালোর এর সুশ্রী গীতা গোপালজী। চন্ডীগড়ের শিল্পী ডাঃ সৌভাগ্য বর্ধন বৃহস্পতিজী সঙ্গীত পরিবেশন করে সভাকক্ষের দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এন নিগমজী। পুণে এর শিল্পী শ্রীমতী অশনী মোদক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে সরোদ পরিবেশন করে শ্রীবিবেক নবরেজী। নাগপুর থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতে উপস্থিত হন রাজেশ্বর বোবড়েজী। আজমীর এর শিল্পী আনন্দ বৈধ এর সঙ্গীত দর্শকদের স্মরণে থাকবে দীর্ঘদিন।

সঙ্গীত মহোৎসবের সমাপ্তি দিবসে প্রভাতী গায়ন পরিবেশন করেন সুলোচনা মোধেজীও তার সম্প্রদায়। সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সতীশ বর্মাজী। পরে পশ্চি মবঙ্গের অধীন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ভায়লিন শিল্পী আকাশরাম তার পরিবেশনায় দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ভোপাল এর শিল্পী শাশ্বতী মণ্ডল স্মরণ করিয়ে দেয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা। ঘুঙুরের সুরের জাদুতে মুগ্ধ করেন শিল্পী অনুরাধা সিং। পশ্চি মবঙ্গ প্রান্তের শিল্পী কৌশিক মুখার্জির সরোদ বাদন সকলের কাছে হৃদয়গাহী হয়ে ওঠে শিল্পী নিজস্ব দক্ষতায়।

তিনদিন ব্যাপী সঙ্গীত মহোৎসবে সমাপ্তি হয় পদ্মশ্রী পণ্ডিত সুরিন্দর সিংজীর সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে।

রঙ্গম

সংস্কার ভারতীর বি(্ব নাট্য দিবস

শিশু-কিশোর নাট্যমেলা

দেবাশিস কবিরাজ॥ গত ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় গিরিশ মঞ্চে শিশুকিশোর নাট্যমেলায় সমবেত হয়েছিল পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের শিল্পীরা। এরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিস্কার' অবলম্বনে একটি নাটিকা ও 'বিনি পয়সার ভোজ' নাটকটি এবং উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর টুনটুনি ও রাজার গল্প এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে। এছাড়া তারা পরিবেশন করে চন্ডালিকা নৃত্য নাট্যের অংশ বিশেষ এবং মূকাভিনয়ে দুর্যোধনের পাশা খেলায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা।

দ্য হোলি একাডেমী এবং সংস্কার ভারতীর বাগুইআটি শাখার শিশু শিল্পীদের স্বচ্ছন্দ সংলাপ ও সাবলীল অভিনয় দর্শকরা উপভোগ করেন।এবারের নাট্যমেলায় বেহালা অঞ্চলের 'নবপ্রয়াস' প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণ করেছিল। এটি একটি মানসিক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান। এখানে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে পেশাগত শি(ারও ব্যবস্থা আছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম পর্যায়ে চন্ডালিকা নৃত্য নাট্যের অংশবিশেষ উপস্থাপিত করল। সঙ্গীত ও নৃত্যের ঐক্যতানে দর্শক একবারও মনে করতে পারেননি যে শিশু কিশোর শিল্পীরা শ্রবণ (মতা ছাড়াই (বধির) নির্ভুলভাবে শুধুমাত্র শি(কের সামান্য ইঙ্গিতকে আশ্রয় করে নেপথ্য সঙ্গীতের সঙ্গে নেচে চলেছে।

পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পীরা মূকাভিনয় করে তুলে ধরল মহাভারতের সেই পাশা খেলার দৃশ্যটি যেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ(দ্রৌপদীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাঁকে র(া করছেন। নবপ্রয়াসের শিশুরা তাদের দ(তায় প্রমাণ করল যে কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তারা মনোবল ও দৃঢ়তায় স্বাভাবিক জীবন ছন্দে পা মিলিয়ে চলতে স(ম।

এই দিনের নাট্য সন্ধ্যার শেষ নাটকটি অভিনয় করে 'আনন্দ পাঠশালার' ছাত্রছাত্রীরা। টুনটুনি ও রাজার গল্পে টুনটুনি পাখির নামভূমিকায় সুমনা মণ্ডলের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অন্য শিল্পীরাও তাদের যথোচিত অভিনয়ে দর্শকদের প্রশংসা পায়।

সমাজের যে শিশুরা আর্থিক বা অন্য কারণে সঠিক সুযোগ পাচ্ছে না (পথশিশু), তাদেরই অস্তিত্ব, বিকাশ, নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণের অধিকার র(ার জন্য আনন্দপাঠশালা কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ নাট্য প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য শিশুর চরিত্র গঠনে নাটকের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে আগ্রহ থাকলে পাঠ্যপুস্তকের থেকে নাটকের সংলাপ শিশুরা তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ করতে পারে।

সংস্কার ভারতীর উদ্দেশ্য শিশু কিশোর ও নবীন প্রজন্মের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সর্বস্তরের শিশুদের মঞ্চনাটকে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ ও সুযোগ প্রদানের তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

ছড়ার গান ফিরে এলো

বিশেষ সংবাদদাতা॥ আজকাল বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে রিয়েলিটি শো-এর দৌলতে বহু ছোট ছোট শিশুদের পাকা গাইয়েদের মতো মাইক হাতে লিটিল চ্যাম্পস্ বা ওই ধরনের অনুষ্ঠানে গান গাইতে প্রায়শই দেখা যায়। কিন্তু এদের দিয়ে যে সব গান গাওয়ানো হয় তার মানে কি এরা জানে? হিন্দী বা বাংলা ছায়াছবির চটুল গান এদের শেখানো হয়। এরাও তোতাপাখির মতো সেইসব গান পারদর্শিতার সঙ্গে গেয়ে সবাইকে অবাক করে দেয়। কিন্তু এমন যদি হতো, গ্রুমিং করার সময় এদের শেখানো হ'ত 'হাট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম' বা 'বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে' বা 'এক এককে এক, দুএককে দুই, গু(মশায় নামতা পড়ান' বা এমন ধরনের বাংলা ছড়ার গান। যা আজকালকার শিশুরা শুনতেই পায় না। এক সময় যা ছিল বাংলা গানের ঐতিহ্য।

সম্প্রতি এমন ধরনের বেশ কিছু ছড়ার গান শোনা গেল পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী কিছু শিশুদের কণ্ঠে। শুনতে শুনতে নষ্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন মন চলে যাচ্ছিল শৈশবের দিনগুলোয়। মনে পড়ে যাচ্ছিল সনৎ সিংহ, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় বা জপমালা ঘোষের মতো শিল্পীদের কথা। গত ২০ মার্চ শনিবার সংস্কার ভারতীর দ(ণ হাওড়া শাখা কেশব চন্দ্র চত্র(বর্তী স্মৃতির(া সমিতির সঙ্গে যৌথভাবে শিবপুরের 'কেশব স্মৃতি' ভবনে আয়োজন করেছিল ছড়ার গানের এক প্রতিযোগিতার। উদ্যোক্ত(াদের এই অভিনব প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে একজন বিচারক বলেই ফেললেন, ছড়ার গানতো আজকাল শোনাই যায় না। এরা যে ছড়ার গান আবার শিশুদের মুখে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তারজন্য এরা অবশ্যই প্রশংসা পাবেন। উল্লেখযোগ্য, এই প্রতিযোগিতায় আরও ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজ(ল গীতি, লোকনৃত্য, রবীন্দ্রনৃত্য, অঙ্কনের মতো বিষয়সমূহ।

শব্দরূপ - ৫৪৫ মঞ্জুষা বৈরাগী

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	১৩				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. প্রথম তিনে লেবুবিশেষ, শেষ দুয়ে বৎসর আসলে ব্রহ্মার অন্য নাম, ৫. হলাহল পানের ফলে শিবের এই নাম, শেষ দুয়ে গলা, ৭. ধ্রুব জননী ও রাজা উত্তানপাদের প্রথমা স্ত্রী, প্রথম ঘরে শুভসূচক, ৯. সর্বনামে তাহার বা তার, শেষ দুয়ে খাজনা, ১১. অন্য নামে চন্দ্র, মধ্যে ধ্বংস, প্রথম ঘরে স্বরবর্ণের সপ্তম অক্ষর, ১৩. রবিঠাকুরের এক শিশু কবিতা, শেষ তিনে নর।

উপর-নীচ ঃ ২. স্বর্গগঙ্গা, প্রথম দুয়ে হ্রাস, ৩. স্বর্গের গোমাতা সুরভির কন্যা, একে-দুয়ে শিবের প্রধান এক অনুচর, ৪. বিষ্ণু, গোলোক, শেষ দুয়ে দোমনা, ৬. রাধিকার জনৈকা সখী, আগাগোড়া বল্লরি, ৮. অন্ধকার, আগাগোড়া বাণ, ১০. ইন্দ্রলোকের সর্বকামনা পূরণকারী দেববৃক্ষ, ১১. চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম ও প্রধান বেদ, ১২. জহ্নুমণির কন্যা, গঙ্গাদেবী।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪৩

■	লো	ক	পা	ল	■	■	ঊ
ত্র	পা	■	■	খা	■	■	র্মি
■	মু	■	■	ই	ল	বি	লা
মা	দ্রা	জ	■	■	গ	■	■
■	■	ন	■	■	ন	ধ	র
দি	বা	ক	র	■	■	র্ম	■
লী	■	■	ত	■	■	ব্র	হ্মা
প	■	■	ন	চি	কে	তা	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া,
বেড়াবেড়িয়া,
বাগনান, হাওড়া-৩

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● **৫৪৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৭ মে, ২০১০ সংখ্যায়**

পূর্ণকুম্ভ-২০১০

(১১ পাতার পর)

হরিদ্বারে ৬-৭-৮ এপ্রিল পরিষদের কার্যকর্তা সম্মেলনে হিন্দু সমাজের অস্মিতা—স্বাভিমানবোধসহ হিন্দুত্বের সংস্কারকে প্রতিটি পরিবারে দৃঢ় করতে কার্যকর্তাদের আগ্রহ করা হয়। নীলধারায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিশাল ক্যাম্পে প্রায় দু'হাজার কার্যকর্তা একত্রিত হয়েছিলেন। সাধু সন্তদের জন্য আলাদা শিবির ছিল। তিনদিনের সম্মেলনে কখনও বা রামদেব বাবা, কখনও বা লালবাতি লাগানো গাড়ীর আনাগোনা। কার্যকর্তারা অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের সংকল্প নিয়ে, পতিতপাবনী গঙ্গায় অবগাহন করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ফিরেছেন। ভারতবর্ষ পূণ্যভূমি, দেবভূমি, 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" কেবল কবির কল্পনা নয়—ভারতের তীর্থক্ষেত্র কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধারস্থান, মুনি-ঋষিদের আধ্যাত্মিক সাধনার স্থান। তাই আজও দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার গলাধকরণ করেও বিলাসিতার মোহে মোহাচ্ছন্ন ভারতীয় নরনারীরা সংসারের ত্রিতাপজ্বালার আবর্ত থেকে পরিত্রাণের অমিয় স্পর্শ পেতে বুকভরা আশা নিয়ে তীর্থে তীর্থে ছুটে বেড়ায়। অনাদিকাল থেকে মানুষের অন্তরের গভীরে রয়েছে অমৃতের জন্য এক বুকজোড়া আকাঙ্ক্ষা। পার্থিব ভোগ-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে প্রকৃত সুখ-শান্তি তো দিতেই পারেই না, অধিকন্ত বেশিরভাগ সময়ই তা অশেষ দুঃখ ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই যে দুঃখ, তাপ, অশান্তি, মৃত্যু—এ থেকে মুক্তির কি কোনও পথ নাই? কোথায় অমৃত? এই অমৃতের জিজ্ঞাসা ভারতবর্ষের হিন্দুদের চেতনাকে এক সময় মথিত হয়েছিল। উত্তর তাঁরা পেয়েছিলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্"—আমি তাঁকে জানিয়াছি। তাঁকে জানলেই মানুষ হয় "অমৃতস্য পুত্রাঃ।" তার জন্যই কুম্ভ ২০১০।

সাবধান! কবে না বাপের নাম পাল্টে দেয়!

শিবাজী গুপ্ত

সেসব দিনের কথা, যখন বাঙালী পিতারা এক ডজন/হাফ ডজন সন্তানের জনক হতে ভয় পেতেন না। মা ষষ্ঠীর কৃপায় এক ভদ্রলোকের সংসারে পরপর পুত্র সন্তানের আগমন ঘটছে। তার আন্তরিক বাসনা—প্রত্যেক সন্তানের নামের সঙ্গে 'পতি' শব্দ যোগ করে নামকরণ করবেন। সেমতে প্রথম সন্তানের নাম 'রঘুপতি' থেকে শুরু করে উমাপতি, রমাপতি, সীতাপতি, ধনপতি, গণপতি, নরপতি, ছত্রপতি, সেনাপতি ও বৃহস্পতি-তে এসে থামলেন। ভাবলেন বিয্যুদের বারবেলায় তার সন্তান আগমনের গাড়ি থামবে। এবং আর পতি-অন্ত শব্দ খুঁজতে হবে না। কিন্তু মা ষষ্ঠীর কৃপায় কিছু দিনের মধ্যে একটি পুত্রসন্তান তার আঁতুড় ঘর আলোকিত করল।

ভদ্রলোক তখন এযাবৎ শেষ সন্তানের নামকরণের সমস্যায় পড়লেন, যুৎসই পতি-অন্ত নাম খুঁজে পাচ্ছেন না। তার সমস্যার কথা বন্ধুবান্ধবদের কাছে বললেন। এক ফক্কড় বন্ধু বলল—এর জন্য ভাবনা কিসের? তোর হাতের কাছেই তো নাম রয়েছে; ওই ছেলের নাম রাখ 'ভগ্নীপতি'। ভদ্রলোক বললেন—'তা বেশ বলেছিস। ছেলের নাম ভগ্নীপতি! বেশ ঘরের লোক এবং আপন আপন মনে হচ্ছে। কিন্তু ভাই, গিন্নী যা শুরু করেছে, এরপর যদি ডজন পূর্ণ হয় বা ডজন ছাড়িয়ে যায় তখন কি হবে?'

বন্ধু—কোনও সমস্যা নেই। ডজন পূর্ণ হলে তার নাম হবে যূথপতি। যদি তাও ছাড়িয়ে যায়, তা হলে শেষ সন্তানের নাম হবে দলপতি। তোর ঘরে একটা 'সন্তান দল' গড়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গে রেল স্টেশনের নামকরণ/ নাম পরিবর্তনের বাই শুরু হয়েছিল দেড় শতাব্দী প্রাচীন বজবজ লাইনের 'কালীঘাট' স্টেশনের নাম 'নিউ আলিপুর' নামকরণের মাধ্যমে। তারপর উল্লেখ করা যায় মেট্রো রেলের ভবানীপুর স্টেশনের নাম। স্টেশনের পাশেই অবস্থিত একদা বাংলা ও ভারতের শিক্ষা ও রাজনীতির দুই মহানায়ক স্যার আশুতোষ ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বসতবাড়ি। ভারতবর্ষের শিক্ষাবিদ, আইনবিদ ও রাজনীতিবিদদের মিলন মহল। স্টেশনের নাম পরিবর্তনের বেলায় এই ভবনের নাম বিবেচিত হলো না, অনেক দূরে অবস্থিত 'নেতাজী ভবনে' নামান্তরিত হলো ভবানীপুর স্টেশন। অথচ নেতাজী নামের স্মৃতি-স্মারক ফলকের তো কমতি নেই—সী-পোর্ট থেকে এয়ারপোর্ট কি না হয়েছে!

এ বছরের রেল বাজেট বক্তৃতায় রেল স্টেশনের নামকরণ ও নামপরিবর্তন প্রক্রিয়ায় ইতিহাস ঐতিহ্যকে তো তৃণমূলস্তর থেকে উপড়ে ফেলে সেস্থলে মৌলবাদকে সযত্নে রোপন করা হয়েছে। সারা কলকাতায় তো রবীন্দ্রনাথের নামাবলী ছড়ান রয়েছে—রবীন্দ্র সদন, রবীন্দ্র সরণি, রবীন্দ্র সরোবর, রবীন্দ্র সেতু, রবীন্দ্রকানন, রবীন্দ্রভারতী—আরও কত কি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শ্রাদ্ধ তো কম দূর গড়ায়নি। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য। শ্রাদ্ধের আগের করণীয় কর্ম হলো ঘাট কাজ। সে কাজে সেরেই শ্রাদ্ধ করতে হয়। তাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ঘাটকাজের 'নিমতলা ঘাট'—'রবীন্দ্রঘাট' রাখা হয়েছে। তারপরেও মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনের নাম বদল করে ঠাকুরবাড়ি করার পেছনে কি যুক্তি আছে? মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেসীরা গান্ধীজীর নাম পরিবর্তন কিভাবে মুখ বুঁজে সহ্য করলেন?

দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বে রেললাইন প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বালিগঞ্জ নামে স্টেশন পরিচিত হয়ে আসছে। কিন্তু যেহেতু জাভেদ খান বালিগঞ্জ বিধান সভা কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, তাই তার দিল্ খুশ করার জন্য দিল্লী থেকে বাহাদুর শাহকে তুলে এনে বালিগঞ্জে স্থাপন করা হয়েছে। অথচ স্টেশন থেকে ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম দুর্গতদের সেবা ও আর্তত্রাণে সারা দেশে অগ্রগণ্য ও অনন্য বললে অন্যায় হবে না। টালিগঞ্জ গড়িয়া লাইনে একটি স্টেশন তাঁর নামে রাখার আবেদন উপেক্ষিত হয়েছে। বালিগঞ্জের কথাও বিবেচিত হয়নি। দোস্তের সঙ্গে গোস্তের ভালোবাসা বড়ো গভীর। নিরামিষাশী হিন্দু সন্ন্যাসীর মর্যাদার আসন পাওয়ার আশাই বাতুলতা।

এখানেই শেষ নয়। নাম পরিবর্তনের তালিকা আরও দীর্ঘ। হিন্দুদের উপর অত্যাচারে যে ব্যক্তি বাদশা ঔরঙ্গজেবকেও হার মানিয়েছিল, মহীশূরের হিন্দুদ্বেষী সেই টিপু সুলতানকে 'হিরো' বানিয়ে 'চাঁদনী চক' স্টেশনে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে।

সে সঙ্গে শহীদ মিনারকে শহীদ সুরাবর্দী মিনার নাম করলেই (ক্ষমতায় এসে) সোনায় সোহাগা। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস'-এর নায়ক সুরাবর্দীর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা তো অবশ্যই সেকুলারি কর্তব্য। এই শহীদ মিনারের নীচে দাঁড়িয়েই না তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন! সেকথা ভুললে তো চলবে না! এ প্রসঙ্গে আরেকটা সুপারিশও করতে পারি। এভাবে খণ্ড খণ্ড নাম পরিবর্তনের ঝামেলায় না গিয়ে পরিবর্তনই যখন দলীয় নীতি, তখন আমূল পরিবর্তনই শ্রেয়। ইংরেজদের হারিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা কলকাতার নাম রেখেছিলেন 'আলিনগর'। এখন কলকাতার বদলে 'আলিনগর' নাম পুনরায় চালু করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!

সম্প্রদায় বিশেষকে তেল দেওয়াই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন কাচ্চা কাচ্চা করে তেল না দিয়ে চৌবাচ্চা ভরতি করে দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ। নয় কি? কুৎসিতভাবে রেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে পত্রিকাগুলিকে হাত করা হয়েছে। তাই এসব বিট্‌কেলির কোনও প্রতিবাদ হয় না।

> "শহীদ মিনারকে শহীদ সুরাবর্দী মিনার নাম করলেই (ক্ষমতায় এসে) সোনায় সোহাগা। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস'-এর নায়ক সুরাবর্দীর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা তো অবশ্যই সেকুলারি কর্তব্য। এই শহীদ মিনারের নীচে দাঁড়িয়েই না তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন! সেকথা ভুললে তো চলবে না!"

সংস্কৃত ভারতীর আহ্বান : জনগণনায় দ্বিতীয় ভাষা সংস্কৃত লিখুন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৩ ও ৪ এপ্রিল সংস্কৃত ভারতী'র দক্ষিণবঙ্গ শাখার কার্যকর্তা বৈঠক কলকাতার অভেদানন্দ রোড স্থিত কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ জন কার্যকর্তা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৪ এপ্রিল বিকেলে কেশব ভবন সভাগারে সংস্কৃত অনুরাগী সম্মেলন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমবার অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৬৫ জনের বেশি প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান শিক্ষক, অধ্যাপক, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশজী কামাথ। দীনেশজী তাঁর ভাষণে সংস্কৃত ভারতীর কাজ এবং সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, যে ভাষায় বার্তালাপ বা কথাবার্তা হয় না তা ভাষা হতে পারে না। সংস্কৃত ভারতীর প্রয়াসে সরল সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গের মাধ্যমে সারা ভারতে এবং বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ সংস্কৃতে প্রাঞ্জলভাবে কথাবার্তা বলছেন। আমেরিকায় ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনলোলজির ২৭,০০০ ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য সংস্কৃত। তেমনই রাশিয়াতে সংস্কৃতে গীতার অনুশীলন হচ্ছে। ইংলণ্ডের অনেক স্কুলেই সংস্কৃত আবশ্যিক পাঠ্য। দীনেজী বিশেষভাবে আগ্রহ করলেন আগামী জনগণনায় দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সবাই 'সংস্কৃত' লেখান। সেক্ষেত্রে সংস্কৃত ও সংস্কৃতির রক্ষা হবে।

সভায় পৌরোহিত্য করেন মহানাম মঠের সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।

উপরে ভাষণরত বন্ধুগৌরব মহারাজ, নীচে শ্রোতাদের একাংশ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ব্যতিক্রমী প্রাবন্ধিক প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর বই পাওয়া যায়

★ দে'জ ★ দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রীট ★ সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন ★ কেশব ভবন, ৯এ, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

পাঠক মহোদয়! বইগুলির পাতা উল্টিয়ে দেখতে পারেন। দেশভাগ ও তার আগেপরের কাহিনী জানতে পারবেন।

Swastika
26 April - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

কলকাতায় ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান

স্বাধীনতা সংগ্রামে ডাঃ হেডগেওয়ারের ভূমিকা অনবদ্য

প্রজ্ঞা সম্মানের মানপত্র রাজেন্দ্র অরুণের হাতে তুলে দিচ্ছেন ডঃ যোশী। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ''রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের নামে আজকের এই 'ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান' অনুষ্ঠান। ডাঃ হেডগেওয়ার আপাতঃদৃষ্টিতে দর্শনধারী ও পণ্ডিত তথা বাগ্মী ছিলেন না। তবে তাঁর মনে দেশভক্তির তীব্র অন্তর্জ্বালা (তড়প) ছিল। তা তিনি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারতেন। শ্রীগুরুজীর (সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক) মতো ব্যক্তিত্বও সেকথা অবলীলাক্রমে স্বীকার করেছেন। কেননা তাঁর প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের পিছনে সাধনা ছিল। উপরের কথাগুলি বলেন বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ডঃ দেবেন্দ্রস্বরূপ। গত ১৮ এপ্রিল বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আয়োজিত ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, ডাক্তার হেডগেওয়ার যে বীজ ১৯২৫-এ রোপন করেছিলেন তা আজ বিশাল বটবৃক্ষের মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান। আজকের প্রজ্ঞা সম্মান প্রাপক ঃ রাজেন্দ্র অরুণ প্রথমে স্বয়ংসেবক, প্রচারক। পরে তিনি কথাকার ও লেখক।

এদিন প্রায় অজ্ঞাত অথবা ন্যূনতম চর্চিত একটি বিষয় সবার সামনে তুলে ধরেন শ্রী দেবেন্দ্রস্বরূপ। তিনি বলেন, ডাক্তার হেডগেওয়ার ও সুভাষচন্দ্র পরস্পরকে ভালোভাবে জানতেন, চিনতেন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তাঁদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। উভয়েই নিঃসংশয় ছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, জার্মানী প্রতিশোধ নেবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অপমানকর পরাজয়ের। সেই সুযোগটাই হবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ। যারা অভিযোগ তোলেন—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অথবা সঙ্ঘের নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে কিছু করেননি, হয় তারা এসব কথা জানেন না অথবা জেনেশুনে অভিযোগ করেন। ডাক্তারজীর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার এক অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের স্বাধীনতা। লোকমান্য তিলকের অনন্য অনুগামী ছিলেন ডাক্তারজী। তিনি কংগ্রেসেরও বিভিন্ন পদাধিকারী ছিলেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর দু'বার সুভাষচন্দ্র ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মুম্বই এবং নাগপুরে গিয়েছিলেন। নাসিকের কাছে দেবলালীতে অসুস্থতার কারণে বিশ্রামরত ডাক্তারজীকে মুম্বইতে আনার জন্য সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী ও সঙ্ঘের তৎকালীন সরকার্যবাহ বালাজী হুড্ডার ও ডাঃ রাম সন্ধ্যাগ্রীকে পাঠিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত প্রচণ্ড পরিশ্রমে ডাক্তারজীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। দারুণ অসুস্থ থাকার জন্য কথাবার্তা বা সাক্ষাৎ হতে পারেনি। অনুশীলন সমিতির শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (কালিচরণদা)-র সঙ্গে ডাক্তারজীর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ওয়ার্ধা'র কংগ্রেস নেতা ও বন্ধু আপ্পাজী যোশী ডাক্তারজীকে একক প্রচেষ্টাতেই সঙ্ঘের কাজ শুরু করতে বলেন। ডঃ দেবেন্দ্রস্বরূপ এদিন ডাক্তার হেডগেওয়ার, শ্রীঅরবিন্দ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

সভাপতি ডঃ রমেশ পোখরিয়াল ভাষণ দিচ্ছেন।

চিন্তাধারার সাযুজ্য নানা বর্ণনা সহযোগে ব্যাখ্যা করেন। তবে তিনি শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশ্যে এক যক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, আজ ভারতবর্ষের এই দুর্দশা কেন?

অনুষ্ঠানে মরিশাস থেকে আগত, সেদেশে আন্তর্জাতিক রামায়ণ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্দেশক রাজেন্দ্র অরুণ সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে বলেন, তিনি সঙ্ঘ প্রজ্ঞার এককণা প্রসাদ মাত্র। তাঁর পুস্তক লেখন ও কথাকারের সাফল্যের শ্রেয় সঙ্ঘের। আচরণ জীবনে প্রতীত হলেই আনন্দদায়ক হয়। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরাম সবাইকে কাছে টেনে নিয়েছেন। তেমনই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা সবাইকে সঙ্ঘে এনেছেন, আসার আহ্বান জানিয়েছেন। রামরাজ্যের কল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক। পরাধীনতার কারণে পতন হয় না, পতনের কারণেই পরাধীনতা আসে। পতন থেকেই দাসত্ব আসে—একথা স্বামী রামতীর্থ বলেছেন। মরিশাসকে তিনি রামময় ভূমি বলে উল্লেখ করেন।

সভার অন্যতম বক্তা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী বলেন, রাম এবং রামায়ণ শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কাম্পুচিয়া, কোরিয়া—সর্বত্র পৌঁছেছে। এমনকী মিশরেও রামকথার শিলালিপি রয়েছে। রাবণ বিশ্বের প্রথম সন্ত্রাসবাদী আর জটায়ু সন্ত্রাসের প্রথম বলি। ভারতকে নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও আত্মবলেই মহাশক্তিমান হতে হবে। আমেরিকার কাঁধে চড়ে নয়। এদিন সভায় পৌরোহিত্য করেন উত্তরাখণ্ডের কবি-রাজনীতিক মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল (নিঃশঙ্ক)। তিনি বলেন, রামচন্দ্র পুরুষোত্তম। রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের মতো চরিত্র এদেশেই সম্ভব। রামচন্দ্র জীবনব্যাপী যে বিপত্তির মোকাবিলা করেছেন তা আর কেউ করেননি। এবছরের কুম্ভের রোমাঞ্চক বর্ণনা করে শ্রীপোখরিয়াল বলেন, বিদেশের বিদ্বানরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছে, বিনা নিমন্ত্রণে এভাবে কোটি কোটি মানুষ ধর্মের নামে গঙ্গাস্নানে একত্রিত হতে পারে দেখে। ভারতেই এটা সম্ভব। একদিনে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পুণ্যার্থী স্নান করছেন। এজন্য যে বিশাল দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা (ম্যানেজমেন্ট) প্রয়োজন তা করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্টের জন্য যদি 'নোবেল' পুরস্কার থাকতো তবে মেলা-পরিচালন কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তা পাওয়ার দাবী রাখে।

প্রজ্ঞা সম্মানের মানপত্র ও চেক রাজেন্দ্র অরুণের হাতে তুলে দেন ডঃ মুরলীমনোহর যোশী। এদিনকার সভা পরিচালনা করেন বিমল লাট। সভার শুরুতে মঞ্চস্থ সকলে ডাক্তার হেডগেওয়ারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ডঃ দেবেন্দ্র স্বরূপ বিমল লাট রচিত একটি কাব্যগ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করেন। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রবীণ সমাজসেবী যুগলকিশোর জৈথেলিয়া। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিন্হা, বিদ্যাভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, নন্দকুমার লড্‌ঢা, মহাবীর বাজাজ, প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী প্রমুখ।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com